ই. বি. জি—৮

বাংলা বিষয়ের

ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম

পর্যায়

৩১

ভূমিকা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম আটটি পত্রে বিন্যস্ত। অষ্টম পত্রের পর্যায় ৩১-এর আলোচ্য বিষয় 'বানানবিধি'। পর্যায়টিকে চারটি এককে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি এককের অন্তর্গত বিষয়বস্তু এইরকম ঃ

একক ১১২ ঃ 'বাংলা বানানের বিবর্তন-ধারা' নামের এই এককটিতে দেখানে হয়েছে, দশ-এগারো শতকের চর্যাপদ থেকে শুরু করে বিশ শতকের অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্য পর্যন্ত বাংলাভাষার হাজার বছরের চর্চায় বাংলা বানান কীভাবে নানা কালপর্বে নানারকম প্রবণতা বিচ্যুতি বিভ্রান্তি পেরিয়ে ক্রমশ একটি পরিণামের দিকে এগিয়ে এসে একুশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে।

একক ১১৩ ঃ বানান-প্রয়োগের পাশাপাশি বানান নিয়ে ভাবনা চলছে গত ১২৫ বছর ধরে। এই বানান-ভাবনার ইতিবৃত্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বাংলা বানানের সমতাবিধানের সমস্যার ভাবনা। একই শব্দের নানারকম বানান লেখার ঝোঁক ক্রমশ বানান-বিভ্রান্তিতে ভরে তুলছে যখন বাংলা বানানের চর্চাকে, তখন এই সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার পাশাপাশি সমাধান সন্ধানের চেষ্টাও দেখা গেল ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত উদ্যোগে। একক ১১৩-এর আলোচ্য বিষয় এটাই।

একক ১১৪ ঃ বাংলা বানানের বিভ্রান্তির বড়ো কারণ বাংলা বর্ণমালা আর বাংলা উচ্চারণের অসংগতি— এই সত্য যখন বানান-ভাবুকেরা অনুভব করলেন, তখন সেই অসংগতি দূর করার উপায়টাও তাঁদের ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গেই একক-১১৪-এর আলোচ্য, বাংলা বর্ণমালা এবং তার সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের সম্পর্ক কতটা বিজ্ঞানসম্মত অথবা কীভাবে তাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা সম্ভব, এই বিষয়টি।

একক ১১৫ ঃ বাংলা বানানে যেসব জটিলতা রয়েছে, তার কারণ সন্ধান করে তা দূর করা, বানানকে সরল করে তোলা, সরলীকরণের কী কী সূত্র বাংলা শব্দে প্রযোজ্য এবং কতদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য—এই বিষয়গুলিই একক ১১৫-এর অন্তর্গত। সেইসঙ্গে বাংলা শব্দভাণ্ডার থেকে নানাশ্রেণির শব্দ সংগ্রহ করে, তাদের উপর সরলীকরণের সূত্র প্রয়োগ করে সরলীকরণের পদ্ধতি আর তার প্রয়োগ-সীমা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের সামনে।

এই পর্যায়ের একক-চারটি তৈরি করতে নীচের বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে নানাভাবে—

১. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ঃ আকাদেমি বানান অভিধান (২০০১)।

২. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ঃ প্রসঙ্গ বাংলাভাষা (১৯৮৬)।

৩. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ঃ বাংলা বানান (১৯৯৩)।

৪. নেপাল মজুমদার সংকলিত ঃ বানান বিতর্ক (১৯৯৭)।

৫. পবিত্র সরকার ঃ বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা (১৯৯২)

একক ১১২ ❑ বাংলা বানানের বিবর্তন-ধারা

গঠন

১১২.১ উদ্দেশ্য

১১২.২ প্রস্তাবনা

১১২.৩ মূলপাঠ ১ ঃ চর্যাপদ থেকে অন্নদামঙ্গল

১১২.৩.১ সারাংশ-১

১১২.৩.২ অনুশীলনী-১

১১২.৪ মূলপাঠ-২ ঃ উইলিয়াম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র

১১২.৪.১ সারাংশ-২

১১২.৪.২ অনুশীলনী-২

১১২.৫ মূলপাঠ-৩ ঃ রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-অন্নদাশঙ্কর রায়

১১২.৫.১ সারাংশ-৩

১১২.৫.২ অনুশীলনী-৩

১১২.৬ সহায়ক পাঠ

১১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য, চর্যাপদ থেকে শুরু করে অন্নদাশঙ্কর রায় পর্যন্ত, দশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত, হাজার বছর ধরে বয়ে-আসা বাংলা ভাষার ধারাটির পাশাপাশি বাংলা বানানের ক্রম-বিবর্তনের যে ধারাটি বয়ে চলেছে, সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এককটির নিবিড় পাঠ বাংলা বানানের ধারাবাহিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কালের বিভিন্ন লেখকের হাতে বানান-চর্চার নানারকম প্রবণতার নজিরও আপনাকে দেখিয়ে দেবে। সেইসঙ্গে বানান-লেখার ব্যাপারে আপনি নিজেও ক্রমশ সতর্ক হতে পারবেন, সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বানান-লেখার বিষয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে তুলতে পারবেন।

১১২.২ প্রস্তাবনা

'বানান' কথাটির তাৎপর্য বর্ণের পর বর্ণ সাজানো। 'বর্ণান' থেকে কথাটি এসেছে। বর্ণের পর বর্ণ সাজিয়েই তৈরি হয়ে ওঠে এক-একটি শব্দ। ধরা যাক 'বানান' শব্দটিই। 'ব-া-ন-া-ন'—এই পাঁচটি চিহ্ন পরপর সাজালে তবেই হয়ে ওঠে 'বানান'। মুখের কথায় বলতে গেলে কেবল কয়েকটি ধ্বনির উচ্চারণ, লিখতে গেলেই আবশ্যক হয়ে ওঠে বানান। এই বানানের হাত ধরেই ক্রমশ তৈরি হতে থাকে যেকোনও লেখ্যভাষার ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস। সেইসঙ্গে অলক্ষ্যেই তৈরি হয়ে যায় বানান-প্রয়োগেরও একটি সূক্ষ্ম বিবর্তন-রেখা।

বাংলাভাষার প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ, এর ভাষা আর হরফ হাজার বছরের পুরোনো। এর অর্থ, বাংলাভাষায় বাংলা হরফ-সাজানো বা বাংলা বানানের প্রয়োগ চলছে হাজার বছর ধরেই। চর্যাপদ থেকেই এর শুরু। বাংলাভাষার এই বিবর্তনের পথ ধরে একটু একটু করে তৈরি হয়েছে বাংলা বানানেরও ইতিহাস।

হাজার বছর ধরে পথ চলতে চলতে প্রাচীন-মধ্যযুগের হাতে-লেখা অজস্র পুথির পাতা পেরিয়ে, উনিশ-বিশ শতকের মুদ্রণযন্ত্রের হাত ঘুরে ঘুরে অবশেষে একুশ শতকের মুদ্রণ-প্রযুক্তির নিরাপদ আশ্রয়ে উত্তীর্ণ হল বাংলা বানান। চলার পথে ঘটছে বানানের স্বাভাবিক বিবর্তন, প্রাণবন্ত ভাষার স্বাভাবিক খেয়ালেই। এক লেখক থেকে অন্য লেখকে, এমনকী একই লেখকের পৃথক পৃথক কালপর্বে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে বানান তার রূপ বদল করতে করতে চলেছে। পুথি ধরে ধরে বানান-বিবর্তনের পথ খুঁজে নেওয়া দুঃসাধ্য। বাংলা ভাষাসাহিত্যের নানাযুগের অজস্র বই এখন ছাপার হরফে হাতের কাছেই মিলছে। মূল লেখকের হাতে-লেখা পুথির বানানের সঙ্গে এর কিছু কিছু ফারাক থাকছে, এটা ধরে নিয়েও অগত্যা ছাপার হরফের পথ ধরেই চলুন, যথাসাধ্য সন্ধান করি বাংলা বানানের বিবর্তন-রেখাটি। চর্যাপদ থেকেই শুরু হোক আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস-সন্ধান।

১১২.৩ মূলপাঠ —১ ঃ চর্যাপদ থেকে অন্নদামঙ্গল

বানান নিয়ে আমাদের আজকের তর্ক-বিতর্ক সংশয় বিভ্রান্তি মুখ্যত এই কটি এলাকায় —অ-ও ঈ-ঈ উ-ঊ ঋ-রি অ্যা-এ ঐ-অই ঔ-অউ ং-ঙ-গ জ-য ণ-ন ত-ৎ শ-ষ-স ক্ষ-খ, বিসর্গ আর হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ, রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব। আমাদের লক্ষ্য হবে, হাজার বছরের বানান-চর্চায় এইসব বিভ্রান্তির এলাকাগুলিতে একটু-আধটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া। তা থেকে আন্দাজ করে নেওয়া যাবে নানাযুগের নানারকম

বানান-লেখায় নানারকম লেখকের নানারকম ঝোঁক। আসুন, চর্যাপদের পাতা থেকেই সেসব খুঁজতে শুরু করি, পরপর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমশ পৌঁছে যাই আধুনিক বাংলার গদ্যে-পদ্যে।

চর্যাপদ ঃ দশ-এগারো শতক

চর্যাপদের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে কিছু কিছু শব্দ চিহ্নিত করে দিচ্ছি, লক্ষ করুন সেইসব শব্দের বানান—

১. অ-ও ঃ ও-উচ্চারণে চর্যাপদে কখনও ও-কার দেওয়া হচ্ছে, কখনও অ-কারই থাকছে। যেমন, চর্যা-১এ 'দিঢ় **করিঅ**', কিন্তু চর্যা-৫এ 'নিবাণে **কোরিঅ**'—প্রথমটিতে 'ক', পরেরটিতে 'কো' বানান একই উচ্চারণে (কো উচ্চারণে)। একালের 'কেহ' কথাটি চর্যা-১৮ তে পেয়েছে উচ্চারণ-অনুগ 'কেহো' বানান (**কেহো কেহো** তোহোরে বিরুআ বোলই)।

২. ই-ঈ ঃ সহজে থির **করি** বারুণী সান্ধ (চর্যা-৩)
তো মুহ **চুম্বী** কমলরস পিবনি (চর্যা-৪)
এ বন **চ্ছাড়ী** হোহু ভান্তো (চর্যা-৬)
খুণ্টি **উপাড়ী** মেলিলি **কাচ্ছি**।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু **পুচ্ছি**।। (চর্যা-৮)
**
বামদাহিণ **চাপী মিলি মিলি** মাঙ্গা (চর্যা-৮)

এখানে প্রতিটি চিহ্নিত শব্দই ই-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া, অথচ এদের বানানে কোথাও ই-কার, কোথাও ঈ-কার। করি (করে)-পুচ্ছি (জিজ্ঞেস করে)-মিলি মিলি (মিলে মিলে)-র শেষে ই-কার, পাশাপাশি চুম্বী (চুম্বন করে)-চ্ছাড়ী (ছেড়ে)-উপাড়ী (উপড়ে ফেলে)-চাপী (চেপে)-র শেষে ঈ-কার। **এই বানান-বিভ্রান্তি ঘটেছে যেমন পৃথক কবির কবিতায়** (চর্যা-৩,৪,৬,৮), তেমনি একই কবির একই কবিতাতেও (চর্যা-৮)

৩. উ-ঊ ঃ **সুজ** লাউ সসি লাগেলি তান্তী (চর্যা-১৭)
চন্দসুজ্‌জ দুই চকা .....(চর্যা-১৪)
একই **'সূর্য'** একটি পদে 'সুজ' অন্য পদে **'সূজ্‌জ'**।

৪. **ঐ-অই ঃ** এ **তৈলোএ** এত বিসারা (চর্যা-৩০)
চঞ্চল চীএ **পইঠা** কাল (চর্যা-১)
ভুসুকু ভণই মূঢ়-হিঅহি ন **পইসই** (চর্যা-৬)

লক্ষ করুন 'তৈলোএ' বানানে ঐ-কার, অথচ একই উচ্চারণে 'পইঠা' আর 'পইসই' বানানে 'অই'।

৫. **ঔ-অউ ঃ** **চউশটি** ঘড়িয়ে দেল পসারা (চর্যা-৩)
এক সো পাদুমা **চৌষঠ্ঠী** পাখুড়ী (চর্যা-১০)

'চৌষট্টি' কথাটি কোনও পদে 'চউশটি' (অউ), আবার কোনও পদে 'চৌষঠ্ঠী' (ঔ-কার। একইভাবে 'চতুর্দিশ' কথাটিও একটি পদে (চর্যা-৮) হয়েছে 'চউদিস', অন্যপদে (চর্যা-৬) 'চৌদীস'।

৬. ঙ-ং ঃ আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মো **সাঙ্গ**।
নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই **লাংগ**।। (চর্যা-১০)

একই কবি কাহ্নপাদের একই চর্যাপদে দেখুন 'সাঙ্গ' বানানে 'ঙ' আর 'লাংগ' বানানে 'ং'। খুঁজলে আরও দেখা যাবে, সাঙ্কমত-অঙ্গন-মাঙ্গা-লাঙ্ক বানানের পাশাপাশি চাংগেড়া-এবংকার-তরংগতে-সিংগে বানানের অবাধ আনাগোনা।

৭. জ-য ঃ চর্যাপদের তৎসম বানানে একটিমাত্র 'য' (কাহ্ন কপালী **যোগী** পইঠ অচারে - ১১নং), অ-তৎসম শব্দ-বানানে 'য' নেই, আছে কেবল 'জ'। আজকের যেন-যাও-সূয্যি-যে বানান চর্যাপদে ছিল জেণ-জাহ-সূজ্জ-জে। চর্যাপদের কবিরা জ-ব্যবহারে জ-য-এর দ্বিধা থেকে মুক্ত।

৮. ণ-ন ঃ 'মন' শব্দটি কখনও 'মন' (নিঅ **মন** দে উলাল), কখনও '**মণ**' (জহি মণ ইন্দিঅ); 'শূন্য' কথাটি কখনও 'শূন' (পেখমি দহদিহ সব্বই **শূন**), কখনও 'শূণ' (চিঅ সহজে**শূণ** সংপুন্না)।

৯. শ-য-স ঃ ৫০-নং চর্যাপদে 'শবর' শব্দের তিনরকমের বানান লক্ষ করুন—
**
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে **শবর**শবরী মাতেলা।
হের সে **সবর** নিরেবণ ভইলা ফিটিল **যবরালী**।।

'শেয়াল' শব্দটিও চর্যাপদে কখনও 'শিআলী', কখনও 'ষিআলা', 'চৌষট্টি' শব্দের চউশটি-চৌষঠ্ঠী রূপান্তর একটু আগেই দেখলেন, 'সহজে' কথাটিও 'সহজে' আর 'যহজে' দুরকম বানানেই লেখা রয়েছে।

১০. ক্ষ-খ ঃ 'ক্ষ'-এর প্রয়োগ চর্যাপদে নেই। '**ক্ষণ**'-র বদলে 'খন' আর '**ক্ষুর**'-এর বদলে 'খুর'-এর স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ রয়েছে চর্যা-৬ এর '**খনহ** ন ছাড়অ' আর 'হরিণার **খুর** ন দীসঅ' কথাদুটির মধ্যে। চর্যা-৪ এ দেখতে পাবেন '**ক্ষেপ**'-র বদলে 'খেপ'-র প্রয়োগ (**খেপহু** জোইনি লেপ ন **জাঅ**)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ চোদ্দশতক

চর্যাপদের বানান-প্রয়োগের একটা চেহারা এইমাত্র দেখলেন। এবার দেখুন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বানান-প্রয়োগের কিছু কিছু নমুনা।

১. অ-ও ঃ শব্দশেষে ও-উচ্চারণে ও-কার প্রয়োগের ঝোঁক চর্যাপদের মতো 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেও আছে। ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার প্রায় সর্বত্র—

মারিবোঁ পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল।। (তাম্বুলখণ্ড ঃ পৃ - ১০)
তবেঁ কেহ্নে **আসিবোঁ** মো তোমার সংহতী।। (ঐ)
আবসি **করিবোঁ** তবেঁ তোহ্মার বিনাশ।। (ঐ)
বড় অপমান **পাইলোঁ** এবেঁ **খাইবোঁ** বিসে।। (ঐ)
তোমার অন্তরেঁ **গেলোঁ** রাধিকার থানে।। (ঐ)
আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী।। (রাধাবিরহ ঃ পৃ -১৪১)

তবে কিছু কিছু শব্দে দু-রকম বানানের বিভ্রান্তিও দেখতে পাবেন। যেমন, কত-কতো কোন-কোনো জাঅ-জাওঁ। সেইসঙ্গে 'কাল' আর 'গরূ'-তে দেখা যাবে ও-কার এড়ানোর নজির। 'কেহো' বানানে চর্যাপদের মতো ও-কার প্রয়োগের দিকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির ঝোঁক, ও-কারহীন 'কেহ' খুব কম (কভো **কেহ** না কৈল যেন রস প্রবন্ধে' : রাধাবিরহ ঃ পৃ -১৫১)

'কাহারও' বোঝাতে 'কাহারো' বানান 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকেই শুরু।

২. ই-ঈ ঃ ঈ-কার প্রয়োগের ঝোঁকটা যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বেশ প্রবল, এটা বোঝা যায় চীত-ঊচীত-মতী-আসী-চুরী-দুঈ-ভরী-অনুসরী-মুকতী-স্থিতী-প্রতী-রাতী-মিনতী-উড়ী-তীন-হীত বানান থেকেই। তবে এর মধ্যে দু-চারটি শব্দের বিকল্প বানানে ই-কারের প্রয়োগও দেখা যাচ্ছে। যেমন, আসি-আসী, আনি-আনী দুই-দুঈ বিমতী-বিমতি ঊচিত-ঊচীত। ই-ঈ নিয়ে এ বিভ্রান্তি চর্যাপদে ছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ও থাকছে।

'কি-কী' বানানের যে বিভ্রান্তি একাল পর্যন্ত গড়িয়েছে, তার গোড়াপত্তন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। লক্ষ করুন নীচের উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তির অন্তর্গত 'কি-কী' বানান—

তাম্বুলখণ্ডে ঃ **কি** নাম তাহার কেহেন তার রূপ। (বিশেষণ) (পৃ - ৫)
সে **কি** রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী।। (অব্যয়) (পৃ - ৬)
কুশলে **কি** আছহ নাতিনী। (অব্যয়) (পৃ - ৭)
তা সমে **কি** মোর নেহা।। (বিশেষণ) (পৃ - ৮)
এবেঁ তাক **কি** বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী।। (সর্বনাম) (পৃ - ৯)
তোহ্মার দেহত কাহ্নাঞি না বসে **কি** পীত।। (অব্যয়) (পৃ - ১০)

দানখণ্ডে ঃ সুনিআঁ বা **কি** বুলিবে ঘরের গোআল।। (সর্বনাম) (পৃ - ১৩)
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে **কী**।। (সর্বনাম) (পৃ - ১৮)
গোআলকুলে **কি** তোহ্মে উপছিল সাণ্ড।। (অব্যয়) (পৃ - ৩৭)
এবেঁ সুন্দরি রাধে করিবেঁ **কী**। (সর্বনাম) (পৃ - ৪১)
দধি দুধ বিচি রাধা করিবেহেঁ **কী**। (সর্বনাম) (পৃ - ৬৮)

যমুনাখণ্ডে ঃ আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত **কী**।। (সর্বনাম) (পৃ - ৯৫)

হারখণ্ডে ঃ তোহ্মার থানত আর কহিবোঁ মো **কী**। (সর্বনাম) (পৃ - ১০৫)

বংশীখণ্ডে ঃ কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী।। (সর্বনাম) (পৃ - ১২০)

লক্ষ করুন, এখানে ১৪টি কি-কী বানানের ৮টি প্রশ্নমূলক সর্বনাম, ২টি প্রশ্নমূলক বিশেষণ আর ৪টি প্রশ্নমূলক অব্যয়। এর মধ্যে ৬টি সর্বনাম ঈ-কারান্ত (কী), বাকি ২টি সর্বনামসহ সবকটি বিশেষণ আর অব্যয় ই-কারান্ত (কি)। অর্থাৎ 'কি-কী' বানানে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি থাকলেও সর্বনামে 'কী' আর অন্যত্র 'কি' প্রয়োগের একটি নীতি মোটামুটি তৈরি ছিল 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'।

৩. উ-ঊ ঃ উ-ঊর বিভ্রান্তিও যথেষ্ট রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ এইরকম— উঠ-ঊঠ উচিত-উচিত উড়ী-ঊড়ী উদ্দেশ-ঊদ্দেশ উপরে-উপরে উপহাসে-উপহাসে শুন-শূন (শূন্য)।

৪. ঐ-অই ঃ ক্রিয়াপদে অই-উচ্চারণে ঐ-কারোর ঝোঁক (ভৈল-পৈশে-হৈলা), তবে পাশাপাশি 'অই'র প্রয়োগও দেখা যাবে—হৈব-হইব কৈল-কইলা।

৫. ঔ-অউ ঃ কবি বিভ্রান্ত থাকছেন 'চঊঠ' আর 'চৌঠ' বানানে।

৬. ং-ঙ ঃ 'আঙ্গদ-কঙ্কণ-আঙ্গুলি'র পাশে 'রাংগে' বানানে অথবা পাশাপাশি শঙ্খ-শংখ সঙ্গতি-সংঘাত বানানে বিভ্রান্তি রয়েছে।

৭. জ-য ঃ 'জ' উচ্চারণে 'য' প্রয়োগের বিভ্রান্তি চর্যাপদে ছিল না, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও নেই। আধুনিক বাংলার যখন-যতন-যেন-যবে-যা-যাও-যাহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জখন-জতন-জেন-জবে-জা-জাঅ-জাহার। দুটি-একটি ক্ষেত্রে বিকল্পে যবে-যাইবোঁ-যেন দেখা গেলেও কবির ঝোঁক জ-এর দিকেই।

৮. ঞ ঃ মুখ্যত ইয়া-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার বানানে ঞ-র প্রায়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অব্যাহত থাকছে—আণিঞা গিঞাঁ পাঞাঁ। মাঝে মাঝে স্বয়ং 'কানাই' অবশ্য রয়েছেন 'কানাঞি'-বানানের আবরণে।

৯. ণ-ন ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ণ-ন প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি দ্বিধাগ্রস্ত। বিভ্রান্তির কয়েকটি উদাহরণ—জাণ-জান আগুণ-আগুন এখণ-এখন কাহিণী-কাহিনী কেমণে-কেমনে কোণো-কোন বিণি-বিনি, মন-মণ।

১০. শ-স ঃ শ-সর বিভ্রান্তি দেখুন আকাশ-আকাস পৈশে-পৈসে শুন-সুন বিকাশ-বিকাস শকতি সকতি বানানে। 'বিকাশ-বিকাস', বিকল্প বানানে অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাড়পত্র আছে, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবি এ ব্যাপারে সচেতন থেকে বিকল্প প্রয়োগ করেছেন, এমন সম্ভাবনা কম। 'সশুর' বানানের মধ্যবর্তী 'শ' 'সাসুড়ী'-তে এসে স্বচ্ছন্দে 'স' হয়ে পড়েছে, এ-ও দেখে নিন।

১১. রেফ ঃ বাংলাসাহিত্যে রেফের (র্) প্রয়োগ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ই প্রথম। রেফযুক্ত বানানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব থাকা তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক, সংস্কৃতে বিধান থাকলেও বাংলায় রেফের নীচে একক ব্যঞ্জনের প্রবেশ আরও পরে। আপাতত 'গর্জ্জুন' (বৃক্ষ) ত বটেই, এমনকী 'গর্ধ'-কেও স্বাগত জানানো হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—কাব্যে। এর পাশে 'দুর্জ্জন' দুর্ব্বার' তো আছেই।

১২. ক্ষ-খ ঃ 'ক্ষ'-র প্রয়োগ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'-ই প্রথম। তৎসম 'ক্ষমা'-র পাশে অতৎসম 'ক্ষেমা-ক্ষেপে' প্রয়োগ একাব্যে দেখা গেল। তবে, তৎসম 'ক্ষণ-ক্ষুর' আর অ-তৎসম 'ক্ষুদ' থেকে 'ক্ষ'-কে স্থানচ্যুত করল 'খ', 'ক্ষণ-ক্ষুর-ক্ষুদ' হল 'খনে-খণেক-খুর-খুদ'।

চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পেরিয়ে **চণ্ডীমঙ্গলে** পৌঁছতে বাংলা বানানের পাঁচ-ছ শ বছর কেটে গেল, বানান-বিভ্রান্তির উদাহরণও ক্রমশ কমে এল, সঠিক নির্দিষ্ট বানান-লেখায় কবিরা আরও যত্নবান হলেন। তবে বিভ্রান্তির এলাকা সংকুচিত হয় নি, বরং দুটি-একটি নতুন এলাকায় তার প্রসারণ লক্ষ করা যাবে। কেননা, ততদিনে বাংলা বানানে 'ত'-এর বিকল্পে এল 'ৎ', কবিদের ভাবনা শুরু হল হস্-চিহ্ন আর বিসর্গ (ঃ) নিয়ে। চর্যাপদ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একচ্ছত্র 'জ' চণ্ডীমঙ্গলে এসে 'য'-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হল।

এবারে এক-এক করে প্রতিটি এলাকা ঘুরে আসা যাক —

১. অ-ও ঃ আজকের 'কেহ' চর্যাপদে ছিল ও-কারান্ত 'কেহো', শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঝোঁকটা ও-কারের দিকে থাকলেও তার পাশে উঠে এল দুটি-একটি 'কেহ'। চণ্ডীমঙ্গলের গোড়ার দিকে 'কেহ' আর 'কেহো' চলছে পাশাপাশি প্রায় সমান দাবি নিয়ে। 'কেহ-কেহো' নিয়ে কবি এখানে বিভ্রান্ত। '**কেহো** রথে **কেহো** গজে **কেহো** তুরঙ্গমে'-র ছ-টি পঙ্‌ক্তি পরেই কবি লিখছেন—'সিদ্ধান্ত করয়ে **কেহ কেহ** পূর্বপক্ষ' (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : পৃ-৪৬)। তবে, ক্রমশ 'কেহ' বানানেই কবি স্থির হলেন। অজস্র হৈল-হইল-হল্যার পাশে 'হলো' বানানের ও-কারান্ত চেহারাও দেখবেন 'উজির হলো রায়জাদা' (পৃ-৩০) কথাটির মধ্যে। তবে 'ভাল ত নহিবে তবে' (পৃ-৫২)—'ভাল' 'ত' এখনও ও-কারযুক্ত হয়ে ওঠেনি।

২. **ঈ-ঈ** ঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'-র বানানে ই-কার প্রয়োগের যে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল, চণ্ডীমঙ্গলে তা অনেকটাই কমে এসেছে। ই-ঈর সহাবস্থানে এখানে স্বীকৃত, স্বাভাবিক। 'বোয়ালী'-র পাশেই 'চিঙ্গুড়ি'-র স্বচ্ছন্দ আনাগোনা চলছে, টাঙ্গী-ভঙ্গী-হাতী-শাড়ী-বাড়ীর পাশে নির্দ্বিধায় রয়েছে মরিচ-হাঁড়ি। তবে, বিভ্রান্তি রয়েছে যেমন চুবড়ি-চুবড়ীর মতো অ-তৎসম বানানে, তেমনি দুটি-একটি তৎসম বানানেও। লক্ষ করুন এই কথাটি —'সকল অঙ্গুলি ভরি মাণিকের অঙ্গুরী' (পৃ-২৩২)। অঙ্গুলি-অঙ্গুলী আর অঙ্গুরি-অঙ্গুরী—দুটি করে বানানই সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত। তবে 'অঙ্গুলি'-তে ই-কার আর 'অঙ্গুরী'-তে ঈ-কার নির্বাচনে বানান-বিভ্রান্ত কবিকেই খুঁজে পাই। আবার, পর পর দুটি বাক্যে লক্ষ করুন 'কাঁচলী' আর 'কাঁচলি'র সহাবস্থান—

'মনে করি ভগবতী, **কাঁচলী** নির্ম্মাণে তথি
বিশ্বকর্মে করিলা সোঙরণ।।
সোঙরণে বিশাই আল্য দেবী তাঁরে আদেশিল
কাঁচলি-নির্ম্মাণে দিল মন।' (পৃ - ২৩৩)

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আমরা দেখেছি 'কি-কী' বানান-প্রয়োগে নীতি আর বিভ্রান্তি। চণ্ডীমঙ্গলে 'কী' নেই, বিশেষণ-সর্বনাম হিসেবেও কেবল 'কি'—

১. নারদে বলিব **কি** .....(পৃ - ৪৭)

২. **মাগু** মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ **কি**।। (পৃ - ২০৫)

৩. **কি** কারণে এতগুলা তুলাল্যে ভবন।। (পৃ - ৩১৫)

৪. **কি** আর জিজ্ঞাসা কর.....(পৃ - ২৪৫)

৫. **কি** হেতু ছাড়িলে পতি। (পৃ - ২৪৪)

৩. উ-ঊ ঃ উ-ঊর বিভ্রান্তি সীমিত থাকছে ''ঊরু-উরস্থল'' 'চূণ-চুণ'-এর মতো দুটি-একটি শব্দের বানানে। অ-তৎসম বানানে ঊ ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে।

৪. ঐ-অই ঃ 'ওই' উচ্চারণে ঐ-কার প্রয়োগের ঝোঁক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলে অত্যন্ত বেশি, বৈসে-হৈল-হৈতে-লৈয়া-পৈতার পাশাপাশি বইসে-হইল-হইতে-লইয়া-পইতাও অবশ্য মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। আবার, '**খই**' আর '**দই**' বানানেও ঐ-কারের প্রশ্রয় নেই—'নিধানী করিয়া **খই** তাহাতে মহিষা **দই**' (পৃ - ১৬৫)

৫. ঔ-অউ ঃ ঔ-কারের প্রয়োগ চণ্ডীমঙ্গলে বেশ কম, 'চৌ' বানানেই সীমাবদ্ধ (চৌদিকে-চৌখণ্ডিয়া-চৌরি)।

৬. ঙ-ং ঃ ঙ-র বিকল্পে ং-প্রয়োগের রেওয়াজ চণ্ডীমঙ্গলেও তৈরি হতে দেখছি না। 'অহঙ্কার' বানানের পাশাপাশি 'অহংকার'-এর ব্যতিক্রমী প্রয়োগ থাকলেও সাধারণভাবে ঙ-প্রয়োগ চণ্ডীমঙ্গলের সর্বত্র দেখা যাবে (সঙ্গীত-ভয়ঙ্কর-শঙ্খ-রাঙ্গা)। 'অহংকার' বানানটি বিভ্রান্তি না হয়ে বিচ্যুতিও হতে পারে। কেননা, ঙ-র বিকল্পে ং-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আর দেখা যাচ্ছে না।

৭. ণ-ন ঃ ণ-প্রয়োগের ঝোঁক চণ্ডীমঙ্গলের অ-তৎসম বানানে অব্যাহত, বরং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় একটু বেশিই। অজস্র লোণ-চূণ-মাণিক-বেণ্যা-পয়াণের পাশে দুটি-একটি বেন্যা-পয়ান অবশ্য উঁকি দেয়।

৮. জ-য ঃ 'জ'-এর উচ্চারণে চর্যাপদে 'য' ছিল না, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুটি-একটি ছিল (যাইবোঁ, যান, যেন), চণ্ডীমঙ্গলে 'জোগাব'-এর পাশে 'যোগাব' আর 'জুড়ি'-র পাশে 'যুড়ি' এসে 'জ'-কে ক্রমশ কোণঠাসা করে দিচ্ছে 'য'।

৯. ঞ ঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র 'ঞ' আবদ্ধ ছিল মুখ্যত অসমাপিকা ক্রিয়ায় (আণিঞা-গিঞা-পাঞা), চণ্ডীমঙ্গলে তা স্থানান্তরিত হল গোসাঞি-মুঞি-ঠাঞি-তেঞি-এর মতো কয়েকটি বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামেও।

১০. শ-ষ-স ঃ শ-ষ-স-এর বিভ্রান্তি 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'তে কম।

১১. ক্ষ-খ ঃ চর্যাপদে 'ক্ষ' ছিল না, ছিল কেবল 'খ' (খনহ-খুর), শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'খনে-খুদ-খুরে'-র পাশে দেখা গেল 'ক্ষেমা-ক্ষেপে'-র 'ক্ষ'। চণ্ডীমঙ্গলেও 'খেনে-খুদ' এর পাশাপাশি বাড়তি প্রশ্রয় পেল 'ক্ষেমা-ক্ষেতি-ক্ষুদ-ক্ষেণে' বানানের 'ক্ষ'।

১২. রেফ ঃ রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব নিয়ে কোনও সংশয় এখনও পর্যন্ত শুরু হয় নি। অর্চ্চনা-অর্দ্ধ-আশীর্ব্বাদ-কর্ম্ম-বার্ত্তা-পর্ব্বত-পূর্ব্ব-চতুর্দ্দোল-এর মতো ব্যঞ্জনদ্বিত্ব প্রয়োগ খুব স্বাভাবিকভাবেই চলেছে চণ্ডীমঙ্গলে। তবে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' '**গর্ধ**' বানানে যে ব্যঞ্জনদ্বিত্বের কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি দেখেছিলেন, পরবর্তী বাংলাসাহিত্যে তা আর ফিরে আসে নি। চণ্ডীমঙ্গলেও চারপাশের অজস্র ব্যঞ্জনদ্বিত্বের পাশে দ্বিত্বহীন 'গর্ভ' বানানটিই দেখা যাচ্ছে—

'ছলিয়া আনিয়ে পূর্ব্বে জন্মাইবে তোর **গর্ভে**' (পৃ ঃ ১২১)

১৩. হস্‌চিহ্ন ঃ হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছিল না, চণ্ডীমঙ্গলেই এর প্রয়োগ শুরু হল। চণ্ডীমঙ্গলের কবি অবশ্য হস্‌-প্রয়োগে বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি— সম্পদ-সম্পদ্ বণিক-বণিক্ কোন-কোন্ দুরকম বানানই দেখতে পাই এ কাব্যে।

১৪. বিসর্গ ঃ একইরকমের বিভ্রান্তি রয়েছে বিসর্গ (ঃ) প্রয়োগেও —'পুনঃ' আর 'পুন' দুটি বানানই চণ্ডীমঙ্গলে গৃহীত। বানানে বিসর্গ-প্রয়োগ অবশ্য একাব্যে অত্যন্ত কম। প্রথম প্রয়োগে 'ঃ' নিয়ে দুটি-একটি বানান-বিভ্রান্তি অপ্রত্যাশিত নয়।

১৫. ত-ৎ ঃ 'ত'-এর বিকল্পে 'ৎ'-এর প্রয়োগ মধ্যযুগীয় বানানের নতুন সংযোজনা। সূচনা-পর্বে এ নিয়ে বিভ্রান্তিও স্বাভাবিক — তাবৎ-তাবত দুরকমই চলতে দেখা যায় পাশাপাশি। '**চিৎ** হয়্যা শুতে নারে কুজের প্রকারে' (পৃ - ৯৯) — এখানে 'চিৎ' আসলে 'চিত' বানানের বিচ্যুতি। প্রথম প্রয়োগে 'ৎ'-ও এমনি করে বিচ্যুতি আর বিভ্রান্তির শিকার হল।

এবারে চলে যাই আঠারো শতকের '**অন্নদামঙ্গল**' কাব্যে।

ও-উচ্চারণ বোঝাতে ও-কার প্রয়োগের দ্বিধা আজকের বানানেও কাটেনি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে-চণ্ডীমঙ্গলেও কত-কতো কেহ-কেহোর বিভ্রান্তি দেখেছি। কিন্তু 'অন্নদামঙ্গলে'-র কবি যখন আরো-বারো-পারো-এলো এমনকী 'আমারো' বানান প্রয়োগ করে চলেন একের পর এক, তখন তাঁকে সমকাল থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকতেই দেখি। কয়েকটি নমুনা দেখুন—

১. একে ত নারদ **আরো** বিষ্ণুর আদেশ। (অন্নদামঙ্গল : পৃ - ১৫)

২. অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ **লক্ষ বারো**।
ধুতুরার ফুল তাহে যত দিতে **পারো**।। (অন্নদামঙ্গল : পৃ - ২১)

৩. আমি যে বিধাতা শিব **আমারো** বিধাতা।। (ঐ : পৃ - ৪৯)

৪. **এলো** যথা পশুপতি।। (ঐ : পৃ - ১৭)

অ-তৎসম বানানে ঈ-কারের ঝোঁক অন্নদামঙ্গলে স্পষ্ট। চুরী-গাড়ী-বাড়ী-শাড়ী-দাড়ী-লড়ী-বড়ী-হাতী-বাজী-ভেলকী-মরীচ-মউরী-আমীনের পাশে দুটি-একটি ই-কারান্ত 'বাসি-ঝুড়ি'র সলজ্জ আনাগোনা দেখতে পাই। তা সত্ত্বেও তৎসম অঙ্গুলি-অঙ্গুলী থেকে কবি ই-কারান্ত 'অঙ্গুলি'কেই কেন বেছে নিলেন, বোঝা শক্ত। লক্ষ করুন, চণ্ডীমঙ্গলের 'বোয়ালী' আর 'চিঙ্গুড়ি' দু-শ বছর পর অন্নদামঙ্গলে এসে ই-ঈ-কারের বদল ঘটিয়ে 'বোয়ালি' আর 'চিঙ্গড়ী' হয়েছে, কিন্তু ই-ঈ-র ফারাকটা কেউ ছাড়ে নি—

শিঙ্গী ময়া পাবদা **বোয়ালি** ডানকোণা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।। (অন্নদামঙ্গল : পৃ - ৩১)

চণ্ডীমঙ্গলের 'মরিচ'-ও অন্নদামঙ্গলে 'মরীচ' হয়েছে। 'কি-কী' বানানের বিভ্রান্তি এড়িয়ে কবি এ কাব্যে সর্বনামে-বিশেষণে-অব্যয়ে সর্বত্র 'কি' প্রয়োগ করে গেছেন।

উ-ঊ প্রয়োগে কবিকে বিভ্রান্তি হতে দেখি উরু-ঊরু বানানে—

'অতি দীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরুপর' (অন্নদামঙ্গল : পৃ - ৩৯)
অথচ, 'মণি করিকর ঊরু মনোহর' (ঐ : পৃ - ৩০)

অ্যা-উচ্চারণে এ-কার প্রয়োগ করতে অন্নদামঙ্গলের কবিকেও লিখতে হল চেলা-চেঙ্গ-টেঙ্গরা, এ সমস্যার শুরু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গলের হেন-যেন বানান থেকেই।

ক্রিয়াপদে এবং দুটি-একটি বিশেষ্যেও ওই-উচ্চারণে ঐ-কার প্রয়োগের একটা রেওয়াজ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকেই তৈরি হয়েছিল, চণ্ডীমঙ্গল পেরিয়ে অন্নদামঙ্গলেও তা অব্যাহত। যেমন, হৈল-হৈতে-লৈলা-রৈল-কৈল-মৈলে। এদের পাশে অবশ্য হইল-লইল-লইয়ার মতো বিকল্প বানানও অন্নদামঙ্গলে গৃহীত। তবে,

চণ্ডীমঙ্গলের ‘খই’ আর ‘দই’ বিকল্পে খৈ-দৈ হয় নি, অন্নদামঙ্গলেও ‘কই’ (মাছ) কখনও ‘কৈ’ হয়ে ওঠে নি।

‘ওউ্’ উচ্চারণে ঔ-কাব্যের বিকল্পে ‘অউ’-এর প্রয়োগ চর্যাপদ থেকে শুরু করে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত টিকে রয়েছে। চর্যাপদে আছে চৌষঠ্ঠী-চৌদীসের পাশে চউশটি-চউদিস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে ‘চৌঠ’-র পাশে ‘চউঠ’, চণ্ডীমঙ্গলে চৌদিকে-চৌখণ্ডিয়ার পাশে মউলা-জউগ্রাম, আর অন্নদামঙ্গলে ‘চৌত্রিশ’ ‘হোক’-এর পাশে ‘মউরী’ ‘বউ’।

ঙ-র বিকল্প হিসেবে ং-এর প্রয়োগ চর্যাপদে (লাংগ তরংগতে), শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (শংখ সংঘাত), চণ্ডীমঙ্গলে (অহংকার) দেখেছেন, তবে দুটি-একটির বেশি নয়। অন্নদামঙ্গলে ঙ-র বিকল্পহীন প্রয়োগ দেখবেন (সঙ্কট-সঙ্কল্প-অলঙ্কার)। তবে একক ‘ঙ’-র বদলে যুক্ত ‘ঙ্গ’ লেখার ঝোঁক আছে ‘ভাঙ্গন’ ‘টেঙ্গরা’ চিঙ্গড়ী’ বানানে।

অ-তৎসম বানানে জ-র বিকল্পে য-কে সক্রিয় হতে দেখছি ‘চণ্ডীমঙ্গল’ থেকেই। অন্নদামঙ্গলে তা অব্যাহত। তবে এ নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি (অর্থাৎ একই শব্দের একাধিক বানান) এ কাব্যে নেই।

অ-তৎসম বানানে সংস্কৃতের ণ-ত্ব বিধান মেনে ণ-প্রয়োগের প্রথা চর্যাপদ থেকে শুরু করে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত চলছে (পরগণা-পরাণ-বেণে)। তবে ণ-ন এর বিভ্রান্তি অন্নদামঙ্গলের বানানে নেই। ঞ-র-প্রয়োগও বাংলাকাব্য থেকে বিদায় নিল।

শ-ষ-স প্রয়োগ নিয়ে কোনও বিভ্রান্তির দৃষ্টান্ত অন্নদামঙ্গলে দেখা যাচ্ছে না। বিভ্রান্তি নেই ক্ষ-খ প্রয়োগ নিয়েও—তবে ‘ক্ষণ’ আর ‘খুদ’ বানানে এ দুটি বর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে।

রেফযুক্ত বানানে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব প্রয়োগের নীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গলের মতো অন্নদামঙ্গলেও মান্য করা হয়েছে। এমনকী, সর্ব্ব-সূর্য্য-মর্ম্ম-অর্দ্ধ-মূর্ত্তি বানানের তৎসম সীমানা পেরিয়ে অ-তৎসম ‘আলিবর্দ্দী মুখুর্য্যা বানানেও চলছে এ নীতির অনধিকার চর্চা।

হস্‌চিহ্নের প্রয়োগে অন্নদামঙ্গলের ঝোঁকটা চোখে পড়ার মতো। সংস্কৃত বতুপ্ (বান্) আর মতুপ্ (মান্) প্রত্যয়ে হস্‌চিহ্ন দেওয়ার বিধি প্রতিটি শব্দে মেনে চলছেন অন্নদামঙ্গলের কবি (গুণবান্-জ্ঞানবান্-যত্নবান্- মূর্ত্তিমান্-ধীমান্)। কিন্তু, কোন-কোন্ বানানেই ঘটছে বিভ্রান্তি—অন্নদামঙ্গলের ৫৪ পৃষ্ঠায় ‘**কোন** সুখে যাইব ধরণী’-র পাশে ৩৭ পৃষ্ঠায় দেখবেন ‘কোথা **কোন্** যজ্ঞ হয়’। বিসর্গ-প্রয়োগে বিভ্রান্তির নমুনা দেখুন চণ্ডীমঙ্গলের মতো অন্নদামঙ্গলেও—‘**পুনঃ** কহ কি হইবে এখানে মরিলে’ (পৃ - ৫২), অথচ ‘পুন হবে স্বর্গবাসী’ (পৃ - ৫৪)। তবে বিশেষতঃ-স্বভাবতঃ বানানে বিসর্গ-বিভ্রাট নেই। এমনকী বিদেশি ‘মুজঃফর’ শব্দের বানানেও বিসর্গ-প্রয়োগে কবির দ্বিধা দেখছি না।

১১২.৩.১ সারাংশ—১

দশ-এগারো শতকের 'চর্যাপদে' এই কটি বর্ণ বা চিহ্নের প্রয়োগ শুরুই হয় নি—ঋ ৎ য ক্ষ ঃ আর রেফ (র্)। অতএব, কোনো শব্দ-বানানে ঋ-রি, ত-ৎ, জ-য, ক্ষ-খ, বিসর্গ থাকা বা না-থাকা, রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হওয়া বা না-হওয়া—এ ধরনের সমস্যা তখনও তৈরি হয় নি। বানানে বিভ্রান্তি এসেছে যেসব ক্ষেত্রে, সেগুলি লক্ষ করুন—

১. অ-ও ঃ 'করিঅ'-র পাশে 'কোরিঅ'।

২. ই-ঈ ঃ 'করি-পুচ্ছি-মিলি'-র পাশে চুম্বী-চ্ছাড়ী-উপাড়ী-চাপী।

৩. উ-ঊ ঃ 'সূর্য' অর্থে 'সুজ'-র পাশে 'সুজ্জ'।

৪. ঐ-অই ঃ 'তৈলোএ'-র পাশে 'পইঠা-পইসই'।

৫. ঔ-অউ ঃ 'চৌষঠ্ঠী'-র পাশে 'চউশটি'।

৬. ঙ-ং ঃ 'সাঙ্গ'-র পাশে 'লাংগ'।

৭. ণ-ন ঃ 'মণ'-র পাশে 'মন', 'শূণ'-র পাশে 'শূন'।

৮. শ-ষ-স ঃ 'শবর'-এর পাশে 'সবর' বা 'ষবরালী', 'সহজে'-র পাশে 'ষহজে', 'শিআলী'-র পাশে 'ষিআলা'।

চোদ্দ শতকের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' শব্দ-বানানে শুরু হল ঞ, ক্ষ আর রেফের (র্) প্রয়োগ। তবে এসব বর্ণ বা চিহ্ন নিয়ে বানানে খুব একটা বিভ্রান্তি দেখা যায় নি। ইয়া-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে ঞ-কে কবি মেনে নিয়েছেন সর্বত্র—আনিঞা-গিঁঞা-পাঞা। 'কানাঞি'-ও নির্দ্বিধায় চলছে। দুটি-একটি ক্ষেত্রে 'জ'-এর পাশাপাশি 'য' থাকলেও ('জবে-জাইবোঁ-জেন'-র পাশে 'যবে-যাইবোঁ-যেন) কবি ঝোঁক 'জ' প্রয়োগের দিকেই। তৎসম 'ক্ষমা'-র পাশাপাশি অ-তৎসম 'ক্ষেমা-ক্ষেপে'-ও বেমানান ঠেকছে না। রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব নিয়ে সংশয় তখনও জাগে নি ('গর্জ্জুন' 'গর্ধ')। এবার বানানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে দেখুন কিছু কিছু বিভ্রান্তির পাশাপাশি বিশেষ বর্ণ-প্রয়োগের ঝোঁক—

১. অ-ও ঃ শব্দশেষে ও-কার প্রয়োগের ঝোঁক —মারিবোঁ-আসিবোঁ-করিবোঁ-খাইবোঁ-পাইলোঁ-গেলোঁ-আইলো, এমনকী 'কেহো' 'কাহারো'। তবে বিভ্রান্তি আছে কত-কতো কোন-কোণো জাঅ-জাওঁ বানানে।

২. ই-ঈ ঃ ঈ-কারের ঝোঁক প্রবল—চীত-মুকতী-মতী-আসী-চুরী-স্থিতী-মিনতী। বিভ্রান্তি থাকছে

আসি-আসী আনি-আনী বিমতি-বিমতী দুই-দুঈ উচিত-ঊচীত বানানে। সর্বনামে 'কী' আর অব্যয়ে 'কি' এখান থেকেই শুরু।

৩. উ-ঊ ঃ বিভ্রান্তির উদাহরণ উঠ-ঊঠ উচিত-ঊচিত উড়ী-ঊড়ী উদ্দেশ-ঊদ্দেশ উপরে-ঊপরে উপহাসে-ঊপহাসে শুন-শূন (শূন্য)।

৪. ঐ-অই ঃ ক্রিয়াপদে ঐ-কার প্রয়োগে ঝোঁক —ভৈল-পৈশে-হৈলা। বিভ্রান্তি রয়েছে হৈব-হইব কৈল-কইলা বানানে।

৫. ঔ-অউ ঃ বিভ্রান্তির উদাহরণ 'চৌঠ'-র পাশে 'চঊঠ'।

৬. ঙ-ং ঃ বিভ্রান্তি রয়েছে শঙ্খ-শংখ সঙ্গতি-সংঘাত বানানে।

৭. ণ-ন ঃ বিভ্রান্তির অজস্র উদাহরণের মধ্য থেকে কয়েকটি এইরকম—মন-মণ জান-জাণ আগুন-আগুণ এখন-এখণ কেমনে-কেমণে।

৮. শ-স ঃ বিভ্রান্তি দেখুন—'আকাশ'-এর পাশে 'আকাস', 'শুন'-র পাশে 'সুন', 'সশুর'-এর পাশে 'সাসুড়ী' বানানে।

ষোলো শতকের চণ্ডীমঙ্গলে এসে বানানের এলাকা আরও একটু বাড়ল, শুরু 'ৎ' 'ঃ' আর হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ। বিশেষ বর্ণ-প্রয়োগের ঝোঁক আর বানান-বিভ্রান্তি কতটা ঘটল দেখা যাক—

১. অ-ও ঃ 'কেহ-কেহো'-র বিভ্রান্তি কাটিয়ে কবি ক্রমশ স্থির হচ্ছেন 'কেহ' বানানে। অজস্র হৈল-হইল-হল্যর পাশে দুটি-একটি 'হলো'।

২. ই-ঈ ঃ ঈ-কারের পুরোনো ঝোঁক কমে এসেছে, ই-ঈর এখানে সহাবস্থান। বিভ্রান্তি রয়েছে 'অঙ্গুলি'-র পাশে 'অঙ্গুরী' আর 'কাঁচলি'-র পাশে 'কাঁচলী' বানানে।

৩. উ-ঊ ঃ অ-তৎসম বানানে 'ঊ' ক্রমশ সরে যাচ্ছে 'উ'-কে বসিয়ে। দুটি-একটি বিভ্রান্তি 'চুণ-চূণ' বা 'উরস্থল-ঊরু' বানানে।

৪. ঐ-অই ঃ 'ওই'-উচ্চারণে ঐ-কারের ঝোঁকটাই বেশি। তবু, বিভ্রান্তি রয়েছে বৈসে-বইসে হৈল-হইল হৈতে-হইতে পৈতা-পইতা বানানে।

৫. ঔ-অউ ঃ ঔ-কার বেশ কম, 'চৌ' বানানেই সীমাবদ্ধ।

৬. ঙ-ং ঃ 'ঙ'-র বিকল্পে 'ং' প্রয়োগের রেওয়াজ এখনও তৈরি হয় নি।

৭. জ-য ঃ অ-তৎসম বানানে 'জ'-কে সরিয়ে ক্রমশ 'য' আসছে।

৮. ঞ ঃ অসমাপিকা ক্রিয়া ছেড়ে বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামে বিস্তৃত হল ঞ (গোসাঞি-মুঞি-তেঞি)।

৯. ণ-ন ঃ অ-তৎসম বানানে ণ-প্রয়োগের ঝোঁক এখনও বেশি।

১০. ত-ৎ ঃ 'ৎ'-র শুরু এখানে। 'ত-ৎ'-এর বিচ্যুতি আছে 'চিৎ' বানানে, বিভ্রান্তি আছে 'তাবৎ- তাবত' বানানে।

১১. শ-ষ-স ঃ 'শ-ষ-স'-এর বিভ্রান্তি চণ্ডীমঙ্গলে খুব কম।

১২. ক্ষ-খ ঃ 'ক্ষেণে-ক্ষুদ' আর 'খেনে-খুদ' বানানে ক্ষ-খ-এর বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে।

১৩. ঃ (বিসর্গ) ঃ 'ঃ' প্রয়োগের শুরু এখানেই। অতএব, বিভ্রান্তি থাকছেই দুটি-একটি বানানে (পুনঃ-পুন)।

১৪. হস্‌চিহ্নের প্রয়োগও এখানেই প্রথম। বিভ্রান্তি এখানেও থাকছে (সম্পদ্‌-সম্পদ)।

১৫. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সর্বত্র (পূর্ব্ব-কর্ম্ম-অর্চ্চনা), কোনও বিভ্রান্তি নেই।

আঠারো শতকের 'অন্নদামঙ্গল'-এ কবির বানান-চর্চা কী ধরনের, লক্ষ করুন—

১. অ-ও ঃ ও-উচ্চারণে ও-কার প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রেই দ্বিধাহীন—আরো-বারো-পারো-এলো, এমনকী 'আমারো।

২. ই-ঈ ঃ অ-তৎসম বানানে ঈ-কারের ঝোঁক —চুরী-মরীচ-আমীন-বাড়ী, দুটি-একটি বানানে ই-কারের ঝোঁক —'বাসি' 'ঝুরি'।

৩. উ-ঊ ঃ এখানে বিভ্রান্তি —উরু-ঊরু।

৪. অ্যা-এ ঃ অ্যা-উচ্চারণে এ-কারের প্রয়োগ —চেলা-টেঙ্গরা-চেঙ্গ।

৫. ঐ-অই ঃ বিভ্রান্তি এখনও রয়েছে ক্রিয়াপদের বানানে —হৈল-হইল লৈলা-লইল।

৬. ঔ-অউ ঃ দুটি প্রয়োগই পাশাপাশি —'চৌত্রিশ-হৌক'-এর পাশে 'মউরী-বউ'।

৭. ঙ-ং ঃ ঙ-প্রয়োগে বিভ্রান্তি নেই —সঙ্কট-অলঙ্কার-সঙ্কল্প। 'ঙ'-র বদলে 'ঙ্গ' লেখার ঝোঁক—ভাঙ্গল-টেঙ্গরা-চেঙ্গ।

৮. জ-য ঃ এ নিয়ে বিভ্রান্তি নেই।

৯. ঞ ঃ 'ঞ'-র একক প্রয়োগ এখন থেকে আর নেই।

১০. ণ-ন ঃ এ নিয়েও বিভ্রান্তি নেই।

১১. শ-ষ-স ঃ বিভ্রান্তি নেই এখানেও।

১২. ক্ষ-খ ঃ তৎসম বানানে 'ক্ষ' (ক্ষণ), অ-তৎসম বানানে 'খ' (খুর)।

১৩. ঃ (বিসর্গ) ঃ 'ঃ' প্রয়োগের ঝোঁক—তৎসম 'বিশেষতঃ স্বভাবতঃ'-এর পাশে অ-তৎসম 'মুজঃফর'। বিভ্রান্তি রয়েছে 'পুনঃ-পুন' বানানেও।

১৪. হস্‌চিহ্ন ঃ তৎসম বানানে বিভ্রান্তি নেই (যত্নবান্-ধীমান্), অ-তৎসম বানানে বিভ্রান্তি (কোন- কোন্)।

১৫. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ নির্দ্বিধায় এটা চলছে, এমনকী অ-তৎসম বানানেও (আলিবর্দ্দী-মুখুর্য্যা)

১১২.৩.২ অনুশীলনী—১

১. (ক) চর্যাপদ থেকে নীচের বানান-বিভ্রান্তির প্রতিটি ক্ষেত্রের ১টি করে উদাহরণ লিখুন —অ-ও, ই-ঈ, ঐ-অই, ঙ-ং, ণ-ন, শ-ষ-স।

(খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে নীচের বানান-বিভ্রান্তির প্রতিটি ক্ষেত্রের ১টি করে উদাহরণ লিখুন— অ-ও, ই-ঈ, উ-ঊ, ঔ-অউ, ণ-ন, শ-স।

(গ) চণ্ডীমঙ্গল থেকে নীচের বানান-বিভ্রান্তির প্রতিটি ক্ষেত্রের ১টি করে উদাহরণ লিখুন— ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, ক্ষ-খ, হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ।

(ঘ) অন্নদামঙ্গল থেকে নীচের বানান-বিভ্রান্তির প্রতিটি ক্ষেত্রের ১টি করে উদাহরণ লিখুন— ঐ-অই, ঔ-অউ, হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ, বিসর্গ-প্রয়োগ।

২. (ক) নীচের বর্ণ বা বর্ণচিহ্নের প্রথম প্রয়োগ কোন্ কাব্যে, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে লিখুন— ক্ষ, ৎ, ঞ, য, ঃ, রেফ (র্), হস্‌চিহ্ন (্)।

(খ) চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্য দিয়ে 'কেহ' বানানের রূপান্তর কীভাবে ঘটেছে, দেখিয়ে দিন।

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঐ-কার আর ঔ-কার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

(ঘ) চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে অ-তৎসম বানানে ণ-প্রয়োগের ১টি করে উদাহরণ দিন।

(ঙ) অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে অ-তৎসম বানানে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগের ২টি উদাহরণ দিন।

(চ) প্রাচীন যুগের কাব্যে 'ঞ' বর্ণের একক প্রয়োগের ৫টি উদাহরণ দিয়ে একক বর্ণ হিসেবে এর প্রয়োগ-সীমা নির্দেশ করুন।

৩. (ক) 'ক্ষ'-র বদলে 'খ'-র ৩টি প্রয়োগ চর্যাপদ থেকে দেখান।

(খ) 'ৎ'-প্রয়োগে বানান-বিচ্যুতির ১টি উদাহরণ চণ্ডীমঙ্গল থেকে দিন।

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বানানের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বর্ণ-প্রয়োগের ঝোঁক দেখা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ৩টি করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আর চণ্ডীমঙ্গলে কোন্ কোন্ বর্ণ আর বর্ণচিহ্নের প্রয়োগ শুরু হল, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে জানান।

(ঙ) অন্নদামঙ্গলকাব্য থেকে দুটি করে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে হস্‌চিহ্ন আর বিসর্গ প্রয়োগের বিভ্রান্তি দেখিয়ে দিন।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) 'কাহারও' বোঝাতে 'কাহারো' বানান ..... থেকেই শুরু।

(খ) ..... প্রয়োগের বিভ্রান্তি চর্যাপদে বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই।

(গ) বাংলাসাহিত্যে রেফের প্রয়োগ ..... কাব্যেই প্রথম।

(ঘ) অ-তৎসম বানানে ঈ-কারের ঝোঁক ..... কাব্যে স্পষ্ট।

(ঙ) বিদেশি ..... শব্দের বানানে বিসর্গ-প্রয়োগ রয়েছে ..... কাব্যে।

৫. দশ থেকে আঠারো শতকের বাংলাভাষা-চর্চায় বানানের বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে, চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে বানান-বিভ্রান্তি বানান-বিচ্যুতি আর বানান-প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ প্রবণতার উল্লেখ করে প্রাসঙ্গিক উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

১১২.৪ মূলপাঠ-২ ঃ উইলিয়াম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র

দশ থেকে আঠারো শতক—এই আট-শ বছরের বাংলা বানান-চর্চায় কিছু কিছু বানান-বিভ্রান্তির নমুনা আপনি দেখতে পেলেন এর আগের মূলপাঠে। এবার উনিশ-বিশ শতকের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা চিহ্নিত করব বানান-চর্চার এমন কয়েকটি এলাকা, যেখানে একদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন অন্যদিকে বাঙালিকণ্ঠের উচ্চারণ, একদিকে উৎস-পরিচয়কে ধরে রাখা আর একদিকে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা—এই দুটি বিপরীত ঝোঁকের টানাপোড়নে বাংলা বানান আন্দোলিত হচ্ছে। তৎসম বানানের এই দ্বিধা মূলত হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্ন ঙ-ং শ-ষ-স নিয়ে, রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বিসর্গ-চিহ্ন আর হস্‌চিহ্নের থাকা বা না-থাকা নিয়ে। অ-তৎসম বানানের এলাকায় এসবের সঙ্গে থাকছে অ-ও ঋ-রি ঙ-ঙ্গ জ-য ণ-ন শ-ষ-স ক্ষ-খ-এর দ্বিধা।

এই প্রাথমিক ধারণাটুকু আশ্রয় করে চলুন এবার একালের বাংলা বানানের সম্ভাব্য বিবর্তনের পথ ধরে। সে পথের একপ্রান্তে উইলিয়ম কেরি, আর-এক প্রান্তে অন্নদাশঙ্কর রায়। চলতি মূলপাঠে দেখা যাক, উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র—উনিশ শতকের এই পর্বের বাংলা গদ্যলেখায় বানান-প্রয়োগের কিছু কিছু নমুনা।

উইলিয়ম কেরির বাইবেল-অনুবাদ থেকে একটি বাক্য ঃ

তারপরে ঈশ্বর **নির্মাণ** করিলেন দুই বড় দীপ্তি বড়তর দীপ্তি দিবসের **কর্ত্তৃত্ব** করিতে ক্ষুদ্রতর দীপ্তি **রজনির** কৃতিত্ব করিতে তিনিও **নির্ম্মাণ** করিলেন তারাগণ।

তৎসম-বহুল বাক্যটির অন্তর্গত তিনটি শব্দ-বানান আমাদের চিহ্নিত এলাকার মধ্যে পড়ে — 'নির্ম্মাণ' 'কর্ত্তৃত্ব' 'রজনি'। দেখতে পাচ্ছি, 'নির্ম্মাণ' আর 'কর্ত্তৃত্ব' বানানে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব, আর 'রজনি' বানানে ঈ-র বদলে ই-কারই **পছন্দ**। এর পাশে লক্ষ করুন কেরির 'কথোপকথন' থেকে তুলে-আনা দুটি বাক্য ঃ

তোমরা কয় **যা**।

আমি সকলের **বড়** আমার আর তিন **যা** আছে।

(পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন—প্রথম খণ্ড : পৃ - ১৬৬)

এসব বাক্যে অ-তৎসম (তদ্ভব) শব্দের প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ছে। এখান থেকে দুটি শব্দ 'যা' আর 'বড়' আমরা বেছে নিতে পারি, যা বানান-বিবর্তনের পথে ক্রমশ বিতর্ক তুলেছে, এদের প্রতিদ্বন্দ্বী

হয়ে উঠেছে 'জা' আর 'বড়ো'। তবে, 'দেওর-ভাসুরের বউ' অর্থে সংস্কৃত 'যাতৃ' থেকে তদ্ভব হয়ে আসা 'যা' তাঁর বানানে উৎস-বানানের উত্তরাধিকারকেই রক্ষা করেছে (যাতৃ > যা)। আর, বানানে শব্দশেষের ও-কারের দাবি তখন ওঠে নি বলে 'বড়' অ-কারান্ত হয়েই দেখা দিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরিকে ছেড়ে এবার দেখুন তাঁরই মুন্সি অন্যতম অধ্যাপক **রামরাম বসুর** বানান-প্রয়োগ। ১৮০১ সালে ছাপা তাঁর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বইটি থেকে পর পর দুটি অংশ পড়ুন ঃ

১. যেকালে **দিল্লির** তক্তে হোমাঙ বাদসাহ.....তাহার অনেকগুলি সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর **ঝকড়া** লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল.....।

(পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ঃ প্রথম খণ্ড, পৃ - ৬৫)

২. একটা **চিল্ল পক্ষি তিরেতে** বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল। অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া **চমকিৎ** ছিলেন .....।

(পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ঃ প্রথম খণ্ড, পৃ - ৭৮)

প্রথম অংশের অ-তৎসম 'বাদসাহ' 'ঝকড়া' তার পুরোনো বানানের পোশাক ছেড়ে ক্রমশ পরবর্তীকালে 'বাদশাহ' 'ঝগড়া' হয়ে উঠেছে। তৎসম শব্দে ভরা দ্বিতীয় অংশে একদিকে আছে অশুদ্ধ বানানের 'চিল্ল' 'পক্ষি' 'বিদ্ধিত', আর-একদিকে বিশুদ্ধ বানানের 'শূন্য' 'মহারাজা' 'সম্মুখ' 'অকস্মাৎ' 'তটস্থ'। 'চিল্লী পক্ষী বিদ্ধ' না হয়ে 'চিল্ল পক্ষি বিদ্ধিত' হল নেহাত-ই প্রথম বাঙালি গদ্যকারের আকস্মিক অসতর্কতায়। এমনকী 'প্রথমত' 'চমকিৎ' আর 'তির'-এর বানান নিয়েও সংশয় থেকে যায়। লেখক সতর্ক থাকলে হয়তো শব্দ তিনটি 'প্রথমতঃ' 'চমকিত' আর 'তীর' হয়ে উঠত, যা ঐ সময়ের স্বাভাবিক বানান। কেননা, সংস্কৃত বানানের শস্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিসর্গ মুছে দিয়ে 'প্রথমত' লেখার রেওয়াজ গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে। রামরাম বসুর চিল পাখিটি অবশ্য ধারালো ফারসি 'তির'-এর খোঁচাই খেয়েছে, নদীর তৎসম 'তীর'-এর হাওয়া খায় নি। কিন্তু এখানেও ই-ঈর পার্থক্য সম্পর্কে এতটা সতর্কতা লেখকের কাছে আমরা প্রত্যাশা করব না। তবু, রামরাম বসুর বানান-প্রয়োগে অসতর্কতাজনিত বিচ্যুতি মেনে নিয়েও বিশেষ বিশেষ ঝোঁকের কথা ভাবতে পারি। তৎসম 'পক্ষি' বানানে বিচ্যুতি বা বানানভুল থাকতে পারে, কিন্তু অ-তৎসম 'দিল্লি'-র ঈ-কারান্ত হবার দায় নেই। এমনকী ফারসি 'তির'-ও অশুদ্ধ নয়। 'পক্ষি-দিল্লি-তির' বানান প্রমাণ করে, রামরাম বসু যথাসাধ্য ই-কারের দিকেই ঝুঁকে থাকতে আগ্রহী, ঈ-কার তাঁর পছন্দ নয়। তৎসম 'প্রথমত' বানানের বিসর্গ (ঃ)-বর্জনে লেখক বানানের বিশুদ্ধি রক্ষায় যতটা অসতর্ক তার চেয়ে বেশি সতর্ক বানানকে সরল আর উচ্চারণমুখী করার প্রতি।

আসুন, এবারে আমরা দেখি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর সবচেয়ে নামী লেখক **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের** বানান-প্রয়োগ। ১৮০৮ সালের 'রাজাবলী' থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে দিচ্ছি ঃ

এইরূপে রাজা **ভর্ত্তৃহরি** বনপ্রবেশ করিলে পর মালুয়াদেশ অত্যন্ত অরাজক হইল.....পাত্র-মন্ত্রি প্রভৃতিরা অতি উদ্বিগ্ন হইয়া .....এক নিয়ম করিলেন.....প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক পুরুষ রাজা হইয়া সমস্ত দিন **কাজকর্ম্ম** করে.....।

তৎসম শব্দে ভরা এসব রচনার প্রায় কোনও বানানই গত দু-শ বছরে পালটায় নি। তবে তৎসম 'মন্ত্রী'-র বদলে অশুদ্ধ বানানের 'মন্ত্রি'-র প্রয়োগ সংস্কৃত জানা মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে নিতান্তই একটা অঘটন। এখানে কেবল লক্ষ করার বিষয় এই 'ভর্ত্তৃ' আর 'কর্ম্ম' বানানে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগের বিধি কেরির মতো মৃত্যুঞ্জয়ও মান্য করছেন।

১৮১৩ সালের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে দুটি বাক্য দেখে নিই ঃ

শীলটা ভাল বটে, নোড়াটা যা ইচ্ছা তা। এতে কি **চিকণ** বাটা হয়?

এখানে লক্ষ করুন দুটি অ-তৎসম বানান 'শীল' আর 'চিকণ'। 'শিলা' থেকে তদ্ভব 'শিল' শব্দটির 'শীল' বানানে যে ঈ-কারের বিচ্যুতি, তার মূলে যতটা রয়েছে 'স্বভাব' অর্থে 'শীল' বানানের প্রভাব, তার চেয়েও বেশি রয়েছে ঈ-কারের প্রতি লেখকের ঝোঁক। এমনকী অ-তৎসম হয়ে-যাওয়া **চিকণ**' বানানোর তৎসম উৎস-বানানের 'ণ'-কেও তিনি ধরে রাখছেন, 'ন'-র দিকে ঝুঁকতে চাইছেন না।

এরপর রামমোহন রায়-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য-বানানে পৌঁছনোর আগেই আমরা উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কয়েকটি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে সেই সময়কার বানানের নমুনা সংগ্রহ করে নিই ঃ

১. **দিগ্‌দর্শন, ১৮১৮**

.....আটশত আটানব্বই **শালে** আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার **পূর্ব্বে** আমেরিকা **কোন** লোক **কর্ত্তৃক** জানা ছিল না.....।

২. **সমাচার দর্পণ, ১৮১৮**

আমারদের পণ্ডিতগণ **আগামি** সোমবার **পর্য্যন্ত** স্ব স্ব বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না, অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন নূতন **সম্বাদ** প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি **মার্জ্জনা** করিবেন।

৩. **সমাচার চন্দ্রিকা, ৮ মে, ১৮৩০**

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে **ইঙ্গরেজী** শিক্ষা **করাণ** বিষয়ে **পূর্ব্বে** চন্দ্রিকায় এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল.....সংস্কৃত কলেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে.....তৎ**কর্তৃক** ছাত্র সকল সুশিক্ষিত হইতেছিলেন এক্ষণে সে অধ্যাপক কলেজের **কর্ম্মে** রহিত হইয়াছেন.....।

৪. **সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল, ১৮৩১**

আমরা শুনিলাম সংস্কৃত কলেজের স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রেরদিগের মধ্যে যাঁহারা **ইংরাজী** পড়িতেছেন তাঁহারা **সংপ্রতি** এক দরখাস্ত করিয়াছেন.....

৫. **সমাচার চন্দ্রিকা, ৫ মে, ১৮৩১**

.....শ্রীশ্রী দুর্গোৎসবাদি **দেবার্চনা** এবং পিত্রাদির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি **ধর্ম্ম কর্ম্ম** উঠিয়া গেলেই লোকের উপকার.....।

৬. **সমাচার চন্দ্রিকা, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১**

বাঙ্গালা ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওয়ানাবধি **বিদ্বান্** মহাশয় **কর্ত্তৃক** অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে।.....।

৭. **সমাচার চন্দ্রিকা, ১৯ অক্টোবর, ১৮৩৩**

বিলাতগামি শ্রীরামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের বিষয়। .....এই নাম **বাঙ্গালি** ভিন্ন অন্য দেশীয়র নহে ..... নানাস্থানের **জমীদার** প্রভৃতিকে আমরা পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ **আরজীতে** কেহ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন.....।

৮. **সমাচার চন্দ্রিকা, ২৫ এপ্রিল, ১৮৩৫**

.....বিষয় কর্ম্মাদি করিয়া যে **ধনোপার্জন** করেন তদ্বারা **সর্ব্বদাই** সদ্ব্যয় করা আছে.....।

৯. **সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫**

.....প্রতিমা **বিসর্জ্জনাদি কোন পর্ব্ব** দিনে **সংকীর্ত্তন** বাহির না হইলে ভাল হয়.....।

১০. **সমাচার চন্দ্রিকা, ১২ ডিসেম্বর, ১৮৩৫**

সংস্কৃত পাঠশালায় **ইঙ্গরেজী** অধ্যয়ন রহিত। .....সংস্কৃত ভিন্ন অন্য আর **চর্চ্চা** করিতে হইবেক না। এই **সুসম্বাদে** আমরা অত্যন্ত অহ্লাদিত হইলাম.....কেবল **গবর্ণমেন্টের**...অর্থ নাশ

হইল.....তাহারা না **কেরাণি** হইল না অধ্যাপক.....এতদ্দেশীয়দিগকে **জুরীর কর্ম্মে** নিযুক্ত করিয়াছেন.....তা **নির্দ্ধারিত** হইলে **সর্ব্ব**সাধারণেই বিশেষ উপকৃত হইবেন.....।

১১. **জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩১**

.....এতদ্দেশ**নিবাসি**.....মহাশয়েরা এমত **কর্ম্ম** করেন যে তাহা **কোন** বিশিষ্ট লোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ **কি** ইহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

১২. **জ্ঞানান্বেষণ, ২১ নভেম্বর, ১৮৩৫**

.....**সংপ্রতি** এ প্রদেশে.....মারক হইয়াছে **বিশেষতঃ** ভগবানগোলায় **সর্ব্ব**স্থানে ঐ পীড়া এমত **সাঙ্ঘাতিক**....**রোগী**....**বাঙ্গালি** কবিরাজেরা তাহার কিছুই করিতে পারে না.....**পূর্ব্বাপেক্ষা** অধিক **দুর্ব্বল** করে.....**রোগিরা**....মারা পড়ে অতএব **বাঙ্গালিরা ইঙ্গরেজী**....চিকিৎসায়.....।

১৩. **জ্ঞানান্বেষণ, ২৬ শে মার্চ, ১৮৩৬**

শ্রীশ্রীযুত **গবর্নর** জেনরল বাহাদুর.....উপস্থিত ছিলেন। .....তবে **গবর্ণমেন্টের** আনুকূল্যে....মেডিকেল কলেজ স্থাপন হইয়াছে।

১৪. **জ্ঞানান্বেষণ, ৩০ মার্চ, ১৮৩৯**

.....ঐ ছাত্ররা **ইংরেজী** বিদ্যা কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এতৎ সিদ্ধ হইবে.....।

১৫. **সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ৬ অক্টোবর, ১৮৩৫**

দ্বিতীয়ত ঃ আমারদিগের **ধর্ম্মনাশের** প্রধান কারণ....**ধনোপার্জ্জন** নিমিত্ত .....আপন আপন ভাষার **দুর্দশা** করিয়া.....বনের **পক্ষিকে** ধৃত করিয়া.....।

১৬. **দৈনিক সংবাদপ্রভাকর, ১৮৩৯**

ইদানীন্তন বঙ্গভাষা নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়ে যাঁহারা অনুশীলনকল্পে **অনুরাগি** হইতেছেন তাঁহারা অনায়াসেই অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন....**সংপ্রতি** মধ্যে মধ্যে দুই একখানি.....ভাষা-পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে,.....**ফলবান ও বলবান** হইবে তাহাতে সংশয় **কি?**

বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনা ১৮১৮ থেকে। সূচনা থেকে ১৮৪০—এই সময়ের মধ্যে লেখা যে কটি নমুনা সংগ্রহ করা হল, তা থেকে কিছু বানান বাছাই করে কয়েকটি এলাকায় সাজিয়ে দিচ্ছি ঃ

তৎসম বানান ঃ

১. ই-ঈ ঃ আগামি অনুরাগি নিবাসি রোগি/রোগী বিলাতগামি পক্ষি।

২. ম্-ঙ-ং ঃ সম্বাদ সংপ্রতি সংকীর্ত্তন সাঙ্ঘাতিক ('সঙ্ঘাত'-থেকে)।

৩. শব্দশেষে বিসর্গ ঃ বিশেষতঃ দ্বিতীয়তঃ।

৪. শব্দশেষে হস্‌চিহ্ন ঃ ফলবান বলবান, বিদ্বান্।

৫. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য মার্জ্জনা পুর্ব্বে কর্ত্তৃক/কর্তৃক কর্ম্ম কর্ত্তব্য চর্চ্চা নির্দ্ধারিত সর্ব্ব দুর্ব্বল ধনোপার্জ্জন/ধনোপার্জন সর্ব্বদা সংকীর্ত্তন পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্দশা দেবার্চনা।

অ-তৎসম বানান ঃ

৬. ই-ঈ ঃ কি (সর্বনাম এবং বিশেষণ) বাঙ্গালি ইঙ্গারেজী-ইংরেজী-ইংরাজী জুরী জমিদার আরজী।

৭. শব্দশেষে অ-ও ঃ কোন (Some অর্থে), ভাল (good অর্থে)।

৮. ঙ্গ-ঙ-ং ঃ ইঙ্গারেজী/ইংরেজী বাঙ্গালা বাঙ্গালি।

৯. ণ-ন ঃ করাণ ('করানো' বোঝাতে) কেরাণি গবর্ণমেন্ট/গবর্নর্।

১০. শ-স ঃ শালে ('বছর' অর্থে) কেলাস ('শ্রেণি' অর্থে)

এবার লক্ষ করুন এই সময়কার বানান-প্রয়োগে বাঙালির বিশেষ বিশেষ ঝোঁক কোন্ কোন্ বর্ণের দিকে ঃ

১. ইন্-প্রত্যয়ান্ত তৎসম শব্দের শেষে ঈ-কার প্রয়োগে অনেকক্ষেত্রেই এঁরা ব্যর্থ, অসতর্ক। ঝোঁকটা ই-কার প্রয়োগের দিকেই। ই-ঈ নিয়ে কিঞ্চিৎ দ্বিধাও দেখতে পাচ্ছি কোনও কোনও বানানে (রোগী/রোগি)।

২. 'সম্' উপসর্গের সঙ্গে সন্ধির পরিণামে 'ম্' কখনও ং হয়ে যাচ্ছে ('সংপ্রতি' 'সংকীর্ত্তন'), কখনও বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়েই থাকছে ('সম্বাদ' 'সঙ্ঘাত')। অর্থাৎ বানানে ম্-ং-ঙ-এর দ্বিধা এই সময় থেকেই দেখা যাচ্ছে।

৩. শব্দশেষের বিসর্গ অব্যাহত থাকছে (বিশেষতঃ দ্বিতীয়তঃ)।

৪. শব্দশেষে হস্‌চিহ্ন থাকবে কিনা—এই নিয়ে দ্বিধার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে (ফলবান-বিদ্বান্)।

৫. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগের দিকেই এঁদের ঝোঁক। কেবল দুটি-একটি বানানে (কর্ত্তৃক/কর্তৃক উপার্জ্জন/উপার্জন) এই নিয়ে দ্বিধা ফুটে উঠছে।

৬. অ-তৎসম শব্দের শেষে ঈ-কার প্রয়োগের দিকেই এঁদের প্রবল ঝোঁক। তবে, সর্বনাম বা বিশেষণ হিসেবে 'কী'-র দাবি তখনও পর্যন্ত কেউ অনুভব করতে শুরু করেন নি।

৭. শব্দশেষে ও-উচ্চারণ সত্ত্বেও অ-কারান্ত কোনও শব্দ তখনও পর্যন্ত ও-কারান্ত হয়ে ওঠে নি (কোন ভাল)।

৮. বানানে ঙ্গ-ং-এর দ্বিধা এসময়ে শুরু হয়ে গিয়েছে (ইঙ্গরেজী-ইংরেজী), তবে ঝোঁকটা তখনও ঙ্গ-র দিকেই।

৯. ণ-র প্রতি পক্ষপাত প্রায় সর্বজনীন। 'কেরাণি' ত বটেই, এমনকী 'করানো' বোঝাতে 'করাণ' বানান আজকের চোখে খানিকটা দৃষ্টিকটুই ঠেকছে। ণ-ন এর দ্বিধাও দেখছি 'গবর্ণমেন্ট' আর 'গবর্নর্' বানানে। এ হল ণত্ববিধির বিভ্রান্ত প্রয়োগ।

১০. 'বছর' অর্থে ফারসি 'শাল' আর শ্রেণি অর্থে ইংরেজি 'কেলাস'—বাংলা উচ্চারণে দুটি শ-হ এক, অথচ বাংলা বানানে শ-স এর দ্বিধা তখনও ছিল।

এবার চলুন **রামমোহন রায়ের** কাছে। ১৮২৮ সালে লেখা রামমোহন রায়ের 'ব্রহ্মোপাসনা' থেকে নেওয়া এই অংশটুকু পড়ুন ঃ

প্রশ্ন। তিনি **কি** প্রকার?

উত্তর। তোমাকে **পূর্ব্বেই** কহিয়াছি যে, যিনি এই জগতের কারণ ও **নির্ব্বাহকর্ত্তা** তিনি উপাস্য হন; ইহার অতিরিক্ত তাঁহার **নির্দ্ধারণ** করিতে **কি** শ্রুতি **কি** যুক্তি সমর্থ হয় না।

বানান নিয়ে আজকের দিনে বিতর্ক হতে পারে, এরকম ছ-টি শব্দকে এখানে মোটা হরফে চিহ্নিত করা হল। এদের তিনটি তৎসম (পূর্ব্বে-নির্ব্বাহকর্ত্তা-নির্দ্ধারণ) আর তিনটি অ-তৎসম (কি-কি-কি)। তৎসম তিনটি শব্দেই আছে রেফ, প্রতিটি রেফের নীচেই ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব স্বীকার করেছেন রামমোহন। সংস্কৃত ব্যাকরণে দেওয়া বিকল্পের বিধান (পূর্বে-নির্বাহকর্তা-নির্ধারণ) রামমোহন উপেক্ষা করলেন। আর, তিনটি 'কি'-ই বিশেষণ হিসেবে আজকের বিধানে 'কী' বানান দাবি করছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো পুরোনো সাহিত্যে এর অনুকূলে কিঞ্চিৎ সমর্থনের প্রশ্রয়ও আছে। রেফযুক্ত তৎসম বানানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব থাকবে কি থাকবে না, আর তদ্ভব 'কি' কোথায় 'কী' হবে—একালের বিতর্ক এই নিয়ে। দেখতে পাচ্ছি, রামমোহন রেফের নীচে দ্বিত্ব মানেন, আর, বিশেষণ 'কি'-র ঈ-কার মানেন না। অর্থাৎ বানান-প্রয়োগে তিনি প্রথাকেই মেনে নিচ্ছেন।

এরপরে আসুন **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের** কাছে। বাংলা বানান নির্ধারণে বিদ্যাসাগরের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে। প্রথমে পড়ুন তাঁরই লেখা কয়েকটি বাক্য ঃ

১. এই প্রস্তাব, **প্রথমতঃ** কলিকাতাস্থ **বীটন** সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। .....নিতান্ত অনবকাশ**বশতঃ**, এ **পর্য্যন্ত** আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই; .....এজন্য, **আপাততঃ** এই প্রস্তাব.....প্রচারিত হইল।

২. .....এই ভাষাকে সম্যক **মার্জ্জিত** ও **অলঙ্কৃত** করিয়া গিয়াছেন।

৩. .....**ইরানের** আদিম নিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে, ভারতবর্ষে, **গ্রীস, ইটালি, জর্ম্মানি** প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন।

৪. .....**কলসীর** খাপরা দ্বারা তাহার বারি বহন করিব।

(সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব)

৫. এতদীয় উপাখ্যানভাগ **বাঙ্গালা**ভাষায় **সঙ্কলিত** হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে।

৬. **বিশেষতঃ** যাঁহারা **ইঙ্গরেজী** জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। ('ভ্রান্তিবিলাস'-এর বিজ্ঞাপন)

৭. বিধবাবিবাহ **প্রবর্ত্তন** আমার জীবনের **সর্ব্ব**প্রধান সৎ**কর্ম্ম**।

(শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা চিঠি)

৮. কোনও কোনও অংশ **পরিবর্ত্তিত** এবং চারিটী নূতন পাঠ **সংকলিত**.....।

('বর্ণপরিচয়, ২য় ভাগে'র ৬২-তম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)

৯. কতকগুলি মহানুভবের বৃত্তান্ত **সঙ্কলিত** হইল। ('চরিতাবলী'র বিজ্ঞাপন)

মোটা হরফের শব্দগুলির মধ্যে 'বীটন' 'ইরান' 'গ্রীস' 'ইটালি' 'জর্ম্মনি' 'বাঙ্গলা' 'ইঙ্গরেজী'-এই কটি নাম অ-তৎসম, বাকি পনেরোটি শব্দই তৎসম।

লক্ষ করুন, 'ইরান'-'জর্ম্মনি'তে আজকের লেখকেরাও অনেকে ণ প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝখানে দাঁড়িয়েও বিদ্যাসাগর অ-তৎসম বানানে ণ-প্রয়োগের পক্ষপাতী নন। তবে 'বাঙ্গালা' আর 'ইঙ্গরেজী' বানানে 'ঙ্গ' থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ব্রিটেন-গ্রীস-ইটালি-জর্ম্মনি বানানেও দেখছি ই-ঈকারের প্রয়োগ নিয়ে তাঁর দ্বিধার লক্ষণ।

অ-তৎসম বানানে ই-ঈকারের দ্বিধা মূলত বিদেশি শব্দ-বানানেই সীমাবদ্ধ। এর দৃষ্টান্ত পাবেন 'বর্ণপরিচয়ে'র দুটি বাক্যে—'আর **দেরি** করিব না' আর 'যা **খুসী** তাই করে'। 'দেরি' আর 'খুসী' শব্দদুটি ফারসি থেকে পাওয়া। 'বর্ণপরিচয়' থেকে আরও কয়েকটি বাক্য তুলে দিচ্ছি, যেখানে সহজেই লক্ষ করা যাবে অ-তৎসম (তদ্ভব) শব্দে বিদ্যাসাগর ঈ-কার প্রয়োগকেই অনুমোদন করছেন নির্দ্বিধায়—**পাখী** উড়িতেছে। তোমাদের বাড়ী যাইব। খেলিবার **ছুটী**।

তৎসম-বানানে বিদ্যাসাগরের নীতি বেশ স্পষ্ট, কিঞ্চিৎ দ্বিধা কেবল সংকলিত-সঙ্কলিত বানানে—ং-ঙ নিয়ে। তবে তাঁর ঝোঁকটা যে ঙ-প্রয়োগের দিকেই, তা বোঝা যায়। বিদ্যাসাগরের বানান-নীতি সম্পর্কে উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে যে কটি তথ্য উঠে আসছে তা এইরকম ঃ

১. অ-তৎসম বানানে (মূলত বিদেশি শব্দে) ই-ঈ প্রয়োগে তাঁর দ্বিধা, তবে তদ্ভব বানানে তিনি ঈ-র পক্ষে। এছাড়া, ঙ-র বদলে ঙ্গ আর ণ-র বদলে ন-প্রয়োগের দিকে তাঁর ঝোঁক।

২. তৎসম বানানে ঙ-ং প্রয়োগে তাঁর কিঞ্চিৎ দ্বিধা, তবে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব (পর্য্যন্ত মার্জ্জিত প্রবর্ত্তন সর্ব্ব কর্ম্ম পরিবর্ত্তিত) আর শব্দশেষের বিসর্গ-প্রয়োগে (প্রথমতঃ-আপাততঃ) তিনি কঠোর। ই-ঈ বিকল্পেও ঈ-কারেরই তিনি পক্ষপাতী (কলসী)।

বিদ্যাসাগরের লেখা 'জীবনচরিত' 'বোধোদয়' 'বাঙ্গালার ইতিহাস' 'শব্দ-সংগ্রহ' থেকে বানানের কিছু নমুনা সংগ্রহ করে আজকের বানান-বিতর্কের এলাকায় তাদের সাজিয়ে দিচ্ছি ঃ

১. শব্দশেষে অ-ও ঃ কোন কোন/কোনও কোনও

২. ই-ঈ ঃ ফৌজদারি/ফৌজদারী জমিদার/জমীদার

ইটালি-জর্ম্মনি-ফরাসি/আরবী-পারসী-হিন্দী-ইঙ্গরেজী-দিল্লী

৩. অ্যা-এ ঃ অ্যাস্ট্রনমি/এরিথমেটিক

৪. ঐ-অই ঃ দই-মই

৫. ঔ-অউ ঃ মৌজা/মউ

৬. ঙ্গ-ঙ-ং-ম ঃ বাঙ্গালা-ইঙ্গরেজী অঙ্গুলি-আঙুল-কাঙাল-রঙ সঙ্গীত-সঙ্কেত-সঙ্কলিত-সম্প্রতি

৭. ণ-ন ঃ কর্ণেল-গবর্ণর/রানী-সোনা-কান

৮. শ-স ঃ একুশ/একুস

৯. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ গর্জ্জন-উপার্জ্জন-কর্দ্দম-কর্ম্ম-নির্ম্মাণ-খর্ব্ব

১০. শব্দশেষের বিসর্গ ঃ প্রথমতঃ-আপাততঃ-বশতঃ-ফলতঃ

১১. শব্দশেষের হস্‌চিহ্ন ঃ যত্নবান্-কোন্-শ্রীমান।

পাশাপাশি হাইফেন-যুক্ত বানান একই নীতিতে তৈরি, '/' চিহ্নে বিচ্ছিন্ন-হওয়া বানান ভিন্ন নীতিতে তৈরি। অতএব, একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে— কোন্ কোন্ এলাকায় বিদ্যাসাগরের বানান-নীতি কঠোর, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধা। দ্বিধা আছে কমবেশি এই কটি এলাকায়—অ-ও ই-ঈ অ্যা-এ ঔ-অউ ণ-ন শ-স আর শব্দশেষের হস্‌চিহ্ন নিয়ে। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অথচ বাংলাগদ্যের যথার্থ শিল্পীর সতর্ক বানান-প্রয়োগেও এই যে একই শব্দের অন্ততপক্ষে দুরকম বানানের সন্ধান মিলছে, এর মধ্য দিয়েই বাংলা বানানের ক্রমশ কেন্দ্রচ্যুত হবার প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। এর স্বাভাবিক পরিণাম আজকের বানান-বিতর্ক।

বাংলা গদ্যকে আশ্রয় করে বাংলা বানান বিদ্যাসাগরের পর বঙ্কিমচন্দ্রের দিকেই এগিয়ে চলে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পৌঁছনোর আগে চলুন আমরা বিদ্যাসাগরের সাধুরীতির পাশে একই সময়ে লেখা চলিতরীতির বানান-প্রয়োগ দেখতে **প্যারীচাঁদ মিত্রে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২)** থেকে তুলে-আনা কিছু কিছু বাক্য আর বাক্যখণ্ড পড়ে নিই। প্রথমে দেখা যাক প্যারীচাঁদ মিত্রের বানান-প্রয়োগ—

প্যারীচাঁদ মিত্র ঃ আলালের ঘরের দুলাল, ১৮৫৮

১. মতিলালের **বাঙ্গালা** সংস্কৃত ও **পারসী** শিক্ষা

২. মতিলালের **ইংরাজী** শিখিবার উদ্যোগ

৩. লোকের **সর্বপ্রকারে** সুখ প্রায় হয় না.....বাবুরামবাবু কেবল ধন **উপার্জ্জনেই** মনোযোগ করিতেন। .....**ল্যাখ** রে **ল্যাখ**। .....শিষ্য **কী** করিতেছে.....**চুণের** জল .....পান করাইত। ...কিন্তু **কর্ত্তা** ছাড়েন না; .....গুরুমহাশয়**গিরী** অপেক্ষা **সরকারী ভাল**.....**পোষাক**....এক **যোড়া** কাপড়....**পূজারি** ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন.....শিখাইবার সময় চক্ষু **রাঙ্গা** করেন...

৪. **বাঙ্গালী** ছোট জাতিরা.....কাঁপে, ...দুই **দিক্** দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন.....ও **বাড়ীটা** কার রে?.....খুলে পড়বে **কানের সোনা**....

৫. **সম্প্রতি ইংরাজী** পড়াইতে বাঞ্ছা করি.....

৬. **কাহারো** জলের **কলসী ভাঙিগয়া** দেয়।

৭. ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা **লক্ষ্মী**ছাড়া—**ঊনপাঁজুরে**—বরখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল।

৮. প্রত্যেক **ক্লাশের** প্রত্যেক বালকের প্রতি সমান তদারক হইত না, **ভারি ভারি** বহি.....।

৯. এই আমার **বাহাদুরী**.....সরকার **গিরি কর্ম্মটি** বজায় আছে।

১০. .....**ইংরাজি**ওয়ালা দরখাস্ত লিখ্ছে.....কোথাও বা **সারজনেরা**.....বেড়াচ্ছে—কোথাও বা **সর্দ্দার সর্দ্দার কেরাণীরা** বলাবলি কর্ছে—

১১. **কাঙ্গালিনী** হইয়া থাকি, সেও **ভাল** ....—।

১২. বাবুরাম বাবু **ভারি** মজলিস করিয়া বসিয়াছেন।...ঠকচাচা একখান **চৌকীর** উপর বসিয়া আছেন।

১৩. **জমীদার**বাবুর বাটীতে একটি.....

১৪. **বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা**.....**অহঙ্কার** হইতেই করিয়া থাকে.....।

১৫. আমরা **পুলিশের** লোক.....

এবার আগের মতোই বানান-বিতর্কের এলাকা ধরে ধরে মোটা হরফের শব্দ-বানানগুলি সাজিয়ে দিই ঃ

১. অ-ও ঃ কাহারো ভাল।

২. ই-ঈ ঃ গিরি/গিরী ভারি(ওজনে)-ভারি (খুব)-পূজারি কেরাণী-বাড়ী-পারসী-ইংরাজী-ইংরাজি-বাঙ্গালী-সরকারী-বাহাদুরী-চৌকী-জমীদার-কী-কলসী।

৩. উ-ঊ ঃ চুণ পূজারি-ঊনপাঁজুরে।

৪. অ্যা-এ ঃ ল্যাখ।

৫. ঙ্গ-ঙ-ং-ম ঃ বাঙ্গালা-বাঙ্গালী-কাঙ্গালিনী রাঙ্গা-ভাঙিগয়া/ইংরাজী অহঙ্কার-সম্প্রতি।

৬. জ-য ঃ যোড়া।

৭. ণ-ন ঃ কান-সোনা-সারজন/কেরাণী-চুণ।

৮. শ-য ঃ ক্লাশ-পুলিশ/পোষাক।

৯. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ উপার্জ্জন-কর্ত্তা-কর্ম্ম-সর্ব্ব (তৎসম)-সর্দ্দার (অ-তৎসম)।

১০. শব্দের শেষে বিসর্গ ঃ বিশেষতঃ।

১১. শব্দের মাঝখানে-শেষে হস্‌চিহ্ন ঃ দিক্ (তৎসম) লিখ্‌ছে-কর্‌ছে (অ-তৎসম)/পড়্‌বে।

আলালি বানানের এই তালিকাবদ্ধ গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত থেকে কয়েকটি জায়গায় বাংলা-বানানকে বিবর্তনের পথে একটুখানি এগিয়ে যেতে দেখছি—

১. বিদ্যাসাগর পর্যন্ত শব্দশেষে ও-বর্ণ প্রয়োগ করার রীতি (কোনও কোনও ক্ষেত্রে) একটুখানি টোল খেল প্যারীচাঁদের ও-কার প্রয়োগে (কাহারো)।

২. ঈ-কারের প্রতি **পক্ষপাত** থাকলেও 'ভারি' আর 'পূজারি' বানানে ই-কার প্রয়োগে বানানকে একধাপ এগিয়ে দিলেন প্যারীচাঁদ। তবে এর পাশে গিরি/গিরী-তে ই-ঈ কারের দ্বিধান্বিত প্রয়োগও দেখছি আমরা। আসলে, পুরোনো ঈ-কারের রীতি থেকে খানিকটা দ্বিধা পেরিয়ে নতুন ই-কারের দিকে এগিয়ে যাবার একটা উদ্যোগ প্যারীচাঁদ এক্ষেত্রে দেখালেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'কি-কী' প্রয়োগের কথা মনে রেখেও বলা যায়, পাশাপাশি সর্বনাম 'কী' বানানে ঈ-কার প্রয়োগ উনিশ শতকের একটি বৈপ্লবিক ঘটনা।

৩. উৎস-বানানের প্রতি এতকালের আনুগত্য খানিকটা শিথিল হল 'চুণ' বানানের উ-কারে (চূর্ণ > চুন)। 'পূজারি' বানানের অ-তৎসম অংশে ই প্রয়োগ করাটাও আধুনিকতার লক্ষণ।

৪. বাংলা বানানের উচ্চারণমুখী প্রবণতা একালের। অথচ, সেই প্রবণতাই দেখা গেল প্যারীচাঁদে 'ল্যাখ রে ল্যাখ' কথাটির বানানে। এ-কারের বদলে বিখ্যাতদের মধ্যে 'য়া'-লেখার সাহ উইলিয়াম কেরি দেখিয়েছিলেন (ম্যাগ), প্যারীচাঁদও দেখালেন।

৫. 'কান' আর 'সোনা' বানানে উৎস-আনুগত্য পুরোপুরি অমান্য করে ণ-থেকে ন-তে উত্তীর্ণ হতে দেখছি প্যারীচাঁদকে (কর্ণ > কান, স্বর্ণ > সোনা)। তবু খানিকটা দ্বিধার চিহ্ন থেকে গেল 'চুণ' আর কেরাণী-র ণ-প্রয়োগে।

৬. শ-ষ প্রয়োগেও প্যারীচাঁদ দ্বিধাগ্রস্ত (পুলিশ/পোষাক)।

৭. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব (সর্দ্দার) আর শব্দ-বানানে হস্‌চিহ্ন-প্রয়োগের প্রবণতা অ-তৎসম বানানেও সংক্রমিত (কর্‌ছে লিখ্‌ছে)। তবে হস্-প্রয়োগে প্যারীচাঁদ যথেষ্ট কঠোর নন (কর্‌ছে/পড়্‌বে)।

লক্ষ করবেন, খানিকটা ঐতিহ্যকে মেনে নেওয়া (যেমন, রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব), খানিকটা দ্বিধা-বিভ্রমে জড়িয়ে থাকা (ই-ঈ ণ-ন শ-ষ প্রয়োগ) আর খানিকটা ঐতিহ্যকে অমান্য করে দ্বিধাকে

অতিক্রম করে, এগিয়ে যাওয়া (কাহারো ভারি ল্যাখ ইংরাজী কান-সোনা)—আলালি বানানের এই ত্রিমুখী পরিচয়টাই আপাতত এখানে পাওয়া গেল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' নিয়ে এলেন ১৮৬২-তে, আলালের পরে। একটু আগেই দেখা গেল, বাংলা বানানে প্যারীচাঁদ খানিকটা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু, কালীপ্রসন্ন বানানকে বরং একটুখানি পিছনদিকেই টানলেন। প্যারীচাঁদ 'কান-সোনা'য় ণ-ন থেকে বেছে নিলেন ন-কে, অগ্রাহ্য করলেন 'কর্ণ-স্বর্ণের' উৎস-ঐতিহ্যকে—এটা একটু আগেই দেখেছেন। এবার 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' থেকে এই অংশটি পড়ুন—'**সোনার বেণেরা** তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাট্‌চে। শোভাবাজারের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা.....**লোণা** ইলিশ নিয়ে.....মাতালেরা লাঠি হাতে ক'রে **কাণা** সেজে.....।' দেখুন, কালীপ্রসন্ন কিন্তু 'স্বর্ণ-বণিক-লবণ' থেকে তদ্ভব-হয়ে-আসা 'সোণা-বেণে-লোণা' বানানে উৎস-বানানের ণ-কেই তুলে নিলেন নির্দ্বিধায়। '**চড়্‌কীর** পিঠ' '**জরীর** টুপী' 'ঢাকাই **শাড়ী**' 'বাবুদের **বাড়ী**' 'গির্জার **ঘড়ী**' 'বিধবা **পিসী**' অ-তৎসম বানানে—এসব ঈ-কারের প্রতি হুতোমি পক্ষপাত অত্যন্ত স্পষ্ট। অ-তৎসম বানানে হস্‌চিহ্ন প্রয়োগের তৎপরতায় আলালি আর হুতোমি বানান পাল্লা দিয়ে চলে। হুতোম থেকে এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন—'**চড়্‌কীর** পিঠ **সড়্‌সড়্‌** কচ্চে' 'হাসির **গর্‌রা**' ও 'ইংরাজী কথার **ফর্‌রা**' '**ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি**'। 'বাজতে **লাগ্‌লো**' ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার প্রয়োগের নজির হুতোমি বানানেই প্রথম বিশেষভাবে লক্ষ করছি—'সহর **জুড়লো**' 'বাজতে **লাগ্‌লো**' 'পুরানো **হলো**' 'ঘনিষ্ঠ **হবো**' 'সং সেজে **আস্‌বো**' 'বৃষ্টি **এলো**'। কিন্তু, এর পাশেই থাকছে কিছু কিছু ও-কারহীন ক্রিয়াপদও—'কেটে **গেল**' 'জানা **ছিল**' 'দেখতে **এল**' 'বেরিয়ে **গেল**'। ক্রিয়া শেষে ও-কার থাক আর না-থাকার এই দ্বিধা-বিভ্রান্তি হুতোমে প্রচুর। তা চলছে একালের বানান-প্রয়োগেও।

সাধুরীতির গদ্যধারায় বিদ্যাসাগরের পর **বঙ্কিমচন্দ্র**। বিদ্যাসাগরী গদ্যের বানান দেখলেন, এবার চলুন বঙ্কিমচন্দ্রের বানান-শিল্পের আঙিনায়। দেখা যাক, এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কতটা ঐতিহ্য-অনুসারী আর কতটা ঐতিহ্য-বিরোধী। শব্দ-বানানের কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করা যাক কেবল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ থেকে।

১. **বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান ঃ**

(সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী/১ম খণ্ড ঃ 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভূমিকা)

আরও ইংরাজি-ইংরাজী কর্ত্তৃক কোন পৃথক্‌ বাঙ্গালা বাঙ্গালী বিশেষতঃ ভয়ঙ্কর।

২. **সাম্য ঃ**

আসামী উকীল কার্ব্বন জমীদারী বাঙ্গালি বাহাদুরি লীগ সঙ্গত।

৩. **বাঙ্গালীর উৎপত্তি ঃ**

অন্ততঃ আরবী আর্ম্মি আর্য্য কর্ণেল খ্রীষ্টীয়ান গবর্ণর চতুর্থতঃ ফরাশি ফারসী বর্দ্ধমান ব্রিটন রঙ রঙ্গপুর হিন্দি-হিন্দী।

৪. **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ঃ**

আফিঙ্গ হলো কাণমলা কীল কেরাণী 'কোন-কোন' গাড়ি গোরু চাকরি-চাকরী চেঙ্গরা ছুটি ঠাঙ্গ ডিপুটি বারো বিপদ্ 'ভারি বিচক্ষণ' 'ভারি বোঝা' ভাল মুন্সী মুহুরিগিরি ষোড় রাঙ্গ ল্যাজ সেক্রেটারি হীরা হৌক।

উদ্ধৃত শব্দ-বানানগুলিকে তৎসম-অ-তৎসম বিভাজনে ভাগ করে দিলে তালিকাটি এইরকম হবে—

তৎসম বানান ঃ

১. ঙ-ং ঃ — ভয়ঙ্কর সঙ্গত রঙ্গপুর।

২. শব্দশেষে বিসর্গ ঃ — বিশেষতঃ চতুর্থতঃ অন্ততঃ।

৩. শব্দশেষে হস্‌চিহ্ন ঃ — পৃথক্ বিপদ্।

৪. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ — কর্ত্তৃক আর্য্য বর্দ্ধমান।

অ-তৎসম বানান ঃ

১. ই-ঈ ঃ (ক) দ্বিধা—ইংরেজি-ইংরেজী হিন্দি-হিন্দী চাকরি-চাকরী বাঙ্গালি-বাঙ্গালী।

(খ) ই—ফরাশি বাহাদুরি ভারি ছুটি মুহুরিগিরি গাড়ি সেক্রেটারি ডেপুটি।

(গ) ঈ—আরবী ফারসী জমীদারী উকীল লীগ বাড়ী কীল মুন্সী হীরা আসামী।

২. অ-ও ঃ (ক) অ—কোন ভাল।

(খ) ও—আরও।

(গ) ও-কার—হলো গোরু বারো।

৩. ঋ > রি /রী ঃ ব্রিটন খ্রীষ্টীয়ান।

৪. অ্যা-এ ঃ ল্যাজ কেরাণী।

৫. অউ > ঔ ঃ হৌক।

৬. ঙ্গ-ঙ ঃ বাঙ্গালা রাঙ্গা আফিঙ্গ ঠ্যাঙ্গ চেঙ্গারা রঙ।

৭. ণ ঃ গবর্ণর কর্ণেল সোণা কেরাণী কাণ।

৮. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ কার্ব্বন আর্ম্মি।

এবার দেখে নিন, কোন্ বানান ঐতিহ্য-অনুসারী (উৎসমুখী) আর কোন্ বানান ঐতিহ্য-বিরোধী (উচ্চারণমুখী)—

ঐতিহ্য-অনুসারী বানান ঃ

১. শব্দশেষে ও-উচ্চারণ স্পষ্ট, অথচ তা অগ্রাহ্য করে প্রচলিত বানান মেনে নেওয়া—ভাল 'কোন কোন'।

২. দীর্ঘস্বরের প্রতি অনুগত থেকে প্রচলিত বানান ধরে রাখা—আরবী ফারসী জমীদারী উকিল লীগ বাড়ী কীল মুন্সী হীরা।

৩. ঙ-ঙ্গ-এর বিকল্পে ঙ্গ-র প্রতি ঝোঁক—বাঙ্গালা রঙ্গপুর রাঙ্গা আফিঙ্গ ঠ্যাঙ্গ চেঙ্গারা।

৪. ঙ-ং-এর বিকল্পে ঙ-র প্রতি ঝোঁক—রঙ ভয়ঙ্কর সঙ্গত।

৫. ন-র বদলে ণ-র প্রতি ঝোঁক ঃ

(ক) অ-তৎসম শব্দের বানানে সংস্কৃত ণত্ববিধানের শাসন মেনে চলা—গবর্ণর কর্ণেল হারাণ কেরাণী (র্-এর পর 'ণ')।

(খ) সংস্কৃত উৎস-বানানের ণ-কে ধরে রাখা—সোণা (স্বর্ণ) কাণ (কর্ণ)।

৬. সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন মেনে তস্-প্রত্যয়ের বিসর্গ ধরে রাখা—বিশেষতঃ চতুর্থতঃ অন্ততঃ।

৭. সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন মেনে পদান্ত হস্ ধরে রাখা—পৃথক্ বিপদ্।

৮. জ-য-এর বিকল্পে য-র প্রতি ঝোঁক—যোড়।

ঐতিহ্য-বিরোধী বানান ঃ

১. প্রচলিত রীতি ভেঙে ও-উচ্চারণে ও-কার দেওয়া—হলো গোরু বারো।

২. প্রচলিত রীতি ভেঙে হ্রস্বস্বরচিহ্ন প্রয়োগ করা—ফরাশি বাহাদুরি ভারি ছুটি মুহুরিগিরি গাড়ি সেক্রেটারি ডেপুটি।

৩. প্রচলিত রীতি ভেঙে 'ঋ'-র বদলে 'রি'/'রী' প্রয়োগ করা—ব্রিটন খ্রীষ্টীয়ান।

৪. অ্যা-উচ্চারণে এ-কারের বদলে 'ঢ্যা'-চিহ্ন প্রয়োগ করা—ল্যাজ।

ই-ঈ প্রয়োগে দ্বিধা ঃ

১. একই শব্দের বানানে—ইংরাজি-ইংরাজী হিন্দি-হিন্দী চাকরি-চাকরী বাঙ্গালি-বাঙ্গালী।

২. একই গোত্রের শব্দ-বানানে—
'ফরাশি' অথচ 'আরবী-ফারসী', 'মুহুরি' অথচ 'উকীল', 'গাড়ি' অথচ 'বাড়ী', 'সেক্রেটরি-ডেপুটি' অথচ 'লীগ'।

বঙ্কিমচন্দ্রের বানান-নীতিকে আমরা দুদিক থেকে দেখলাম—তৎসম-অতৎসম বানান-প্রয়োগে আর ঐতিহ্যের অনুসারী বা বিরোধী বানান-প্রয়োগে। দেখা গেল, তৎসম বানানে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহ্যকে পুরোপুরিই মানেন, অ-তৎসম বানানে তিনি মুখ্যত ঐতিহ্য-বিরোধী আর গৌণত ঐতিহ্য-অনুসারী। তবে, হ্রস্বদীর্ঘ স্বরচিহ্ন-প্রয়োগে তিনি অনেকখানি দ্বিধাগ্রস্ত। এর পাশাপাশি একটি বিষয় লক্ষ করুন। রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-প্রয়োগ মূলত ঐতিহ্য-অনুসারী প্রবণতা। তৎসম-বানানের এলাকাতেই এর প্রয়োগ। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র একে তৎসম এলাকার বাইরে টেনে এনে অ-তৎসম বানানেও নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করেছেন। সেই কারণে, তৎসম কর্ত্তৃক-আর্য্য-বর্দ্ধমানের পাশে ঘটেছে কার্ব্বন-আর্ম্মির মতো অ-তৎসম বিদেশি শব্দেও ব্যঞ্জন-দ্বিত্বের অবাঞ্ছিত প্রয়োগ। অবশ্য প্রাক্-বঙ্কিম বানান-চর্চাতেও এর নজির মেলে। ঐতিহ্য-অনুসরণের আর-একটি নমুনা লক্ষ করুন। ণত্ববিধানের শাসন তৎসম শব্দ-বানানে শিরোধার্য, কিন্তু অ-তৎসম বানানের সে দায় নেই। অথচ, ঐতিহ্য-আনুগত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু বেশিমাত্রাতেই আচ্ছন্ন হতে দেখি, যখন অ-তৎসম গবর্ণর-কর্ণেল থেকে শুরু করে হারাণ-কেরাণী পর্যন্ত র-বাহী প্রতিটি বানান র-এর উপস্থিতিকে সমীহ করে ন-র বদলে ণ-কেই আশ্রয় করেছে।

উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত (প্যারীচাঁদ মিত্র আর কালীপ্রসন্ন সিংহকে এর অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে) বানান-প্রয়োগের ধারায় মোটের উপর একটা ঐতিহ্যের ছক যে তৈরি হয়ে উঠেছে, তা আন্দাজ করা যায়। তবে এর পাশাপাশি ঐতিহ্য-বিরোধী প্রবণতাও আমরা লক্ষ করেছি, যদিও তা ঐতিহ্যের জাল ছিঁড়ে বাংলা বানানকে মুক্ত করার মতো ধারালো হয়ে উঠতে পারে নি। ঐতিহ্য-অনুসারী আর ঐতিহ্য-বিরোধী প্রবণতাগুলি এইরকম ঃ

ক. ঐতিহ্য-অনুসারী—

১. শব্দশেষে ও-উচ্চারণ থাকলেও ও-কার না দেওয়া।

২. হ্রস্ব-দীর্ঘ বিকল্পে দীর্ঘস্বরের (ঈ-ঊ) প্রতি ঝোঁক।

৩. অ্যা-উচ্চারণে এ-কারের প্রয়োগ।

৪. ঙ্গ-ঙ বিকল্পে 'ঙ্গ' আর ঙ-ং বিকল্পে 'ঙ'-র প্রতি ঝোঁক।

৫. ণ-ন বিকল্পে ণ-এর প্রতি ঝোঁক।

৬. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব দেওয়া।

৭. শব্দের মাঝখানে বা শেষে বিসর্গ দেওয়ার ঝোঁক।

৮. সংস্কৃত বানানের অনুসরণে হস্ চিহ্ন দেওয়ার ঝোঁক।

৯. তদ্ভব-অর্ধতৎসম বানানে উৎস-বানানের (সংস্কৃত বানানের) প্রতি অনুগত থাকা (স্বর্ণ > সোণা, কর্ণ > কাণ)।

খ. ঐতিহ্য-বিরোধী —

১. ও-উচ্চারণে ও-কার দেওয়া।

২. হ্রস্বস্বরের (ই-উ) প্রতি ঝোঁক।

৩. অ্যা-উচ্চারণে 'অ্যা' 'য়া'-র প্রয়োগ।

৪. ঙ্গ-ঙ বিকল্পে 'ঙ' আর ঙ-ং বিকল্পে 'ং'-র প্রয়োগ।

৫. ণ-ন বিকল্পে 'ন' প্রয়োগ।

৬. রেফের নীচে একক ব্যঞ্জন প্রয়োগ।

৭. শব্দের মাঝখানে বা শেষে বিসর্গ না দেওয়া।

৮. হস্‌চিহ্ন না দেওয়া।

৯. উচ্চারণ-মুখী বানান লেখার ঝোঁক।

১১২.৪.১ সারাংশ—২

এবারে দেখুন গত দুশো বছরের প্রথম দফায় বাংলা গদ্যে বানান-বিবর্তনের চেহারাটি—উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত।

উইলিয়ম কেরির গদ্যে উৎসমুখী বানান লেখারই প্রবণতা (কর্ত্তৃত্ব-নির্ম্মাণ, 'যাতৃ' থেকে 'যা')। রামরাম

বসুর বানান-প্রয়োগে উৎসমুখী থাকার তুলনায় উচ্চারণমুখী হবার প্রবণতা প্রবল (দিল্লি-তির-প্রথমত)। অথচ, তাঁর পরবর্তী গদ্যকার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উৎস-বানানকেই ধরে রাখতে চান 'ভর্ত্তৃহরি-কাজকর্ম্ম' বানানে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-প্রয়োগে বা অ-তৎসম 'চিকণ' বানানে সংস্কৃত 'চিক্কণ'-এর 'ণ'-কে অব্যাহত রেখে।

১৮১৮ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকায় গতানুগতিক বানান-অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা দেখা গেল এই কটি এলাকায়—

১. তৎসম বানানে ই-কারের ঝোঁক—আগামি-অনুরাগি-নিবাসি-রোগি-পক্ষি। অ-তৎসম বানানে ঈ কারের ঝোঁক—ইংরেজী-জুরী-আরজী-জমিদার।

২. শব্দশেষে হস্‌চিহ্ন বর্জনের ঝোঁক—ফলবান-বলবান।

৩. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জনের দুটি-একটি উদাহরণ—দুর্দশা-দেবার্চনা।

এর পাশে, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিও ধরা পড়ছে একই উচ্চারণে দু-রকম বর্ণ প্রয়োগ করার চেষ্টায়—

১. ং-ম-ঙ-ঙ্গ—সম্বাদ-সংপ্রতি (ম-ং), সংকীর্তন-সাংঘাতিক (ং-ঙ) ইংরেজী-ইঙ্গরেজী (ং-ঙ্গ)।

২. ণ-ন— গবর্ণমেণ্ট-গবর্‌নর্‌।

৩. শ-স— শাল-কেলাস।

তবু মোটের উপর এ যুগের বানানে পুরোনো উৎস-বানানের প্রতি অনুগত থাকার আগ্রহটাই যে বেশি, তা বোঝা যায় শব্দশেষে বিসর্গ ধরে রাখায় (বিশেষতঃ-দ্বিতীয়তঃ) রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব প্রয়োগে (পর্য্যন্ত-মার্জ্জনা....) অ-তৎসম বানানে ণত্ব-বিধান মেনে চলায় (করাণ-কেরাণি)।

রামমোহন রায় বানান-প্রয়োগে ঐতিহ্যকেই মানেন। রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব প্রয়োগে তাঁর দ্বিধা নেই, বিশেষ্য-বিশেষণ অব্যয় নির্বিশেষে ই-কারান্ত 'কি' প্রয়োগেও তিনি অবিচল।

বিদ্যাসাগরের বানান-নীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—তৎসম শব্দ-বানানে তাঁর নীতি বেশ কঠোর, তুলনায় অ-তৎসম বানানে তাঁর দ্বিধার এলাকা অনেকখানি প্রসারিত। দ্বিধা রয়েছে ই-ঈ অ্যা-এ ঔ-অউ ঙ-ঙ্গ ণ-ন শ-স বর্ণের প্রয়োগে। তবু এর ফাঁকে 'ঙ'-র বদলে 'ঙ্গ' আর 'ণ'-র বদলে ন-প্রয়োগের ঝোঁকটাও চোখে পড়ে। আবার উল্টোদিকে তৎসম বানানে তাঁর কঠোরতার ফাঁকেও দেখি 'সঙ্কলিত'-র পাশে 'সংকলিত'-র দ্বিধা (ঙ-ং)।

উইলিয়ম কেরি থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত দেখলেন সাধুরীতির বানান-প্রয়োগ। এর পাশে দেখা যাক প্যারীচাঁদ মিত্র আর কালীপ্রসন্ন সিংহের সহজ সাধুরীতি আর চলিতরীতির লেখায় বানান-প্রয়োগের আদলটা

কী ধরনের। প্যারীচাঁদের বানানে দেখবেন মূলত তিনটি রূপ—এক, খানিকটা ঐতিহ্যকে মেনে নেওয়া, দুই, খানিকটা পুরোনো আর নতুন বানানের দ্বিধা-বিভ্রমে জড়িয়ে থাকা, তিন, খানিকটা ঐতিহ্যকে এড়িয়ে নতুন বানানের ঝুঁকি নেওয়া। ঐতিহ্যকে মানা হচ্ছে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-প্রয়োগে ('কর্ত্ত-কর্ম্ম' এমনকী 'সর্দ্দার'), পুরোনো-নতুনের দ্বিধায় জড়ানো হচ্ছে ই-ঈ ণ-ন আর শ-ষ প্রয়োগে (গিরি-গিরী সোনা-চুণ পুলিশ-পোষাক)। আর, নতুন বানানের দিকে এগিয়ে যেতে দেখছি 'কাহারও' বদলে ও-কারান্ত 'কাহারো' প্রয়োগে, উচ্চারণমুখী 'ল্যাখ' বানানে, 'ইঙ্গরাজী'-র প্রথা ভেঙে 'ইংরাজী' লেখায়। হস্‌চিহ্ন-প্রয়োগের পুরোনো প্রথাটিকে চলিতরীতির ক্রিয়াপদে প্রসারিত করাটাও একধরনের আধুনিকতাই (কর্‌ছে-লিখ্‌ছে)। এমনকী, ই-ঈ আর ণ-ন প্রয়োগের দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফাঁকেও একজন প্রগতিশীল প্যারীচাঁদকেই খুঁজে পাওয়া যাবে 'ভারি-পূজারি'-র ই-কারে বা 'কান-সোনা-সারজন'-এর ন-প্রয়োগে। এসব ক্ষেত্রে প্রথা-ভাঙার সাহসটুকু প্যারীচাঁদই দেখালেন প্রথম।

প্রথা-ভাঙা আলালি বানানের পরবর্তী হয়েও হুতোমি বানান খানিকটা প্রথার দিকেই ঝুঁকে থাকল। প্যারীচাঁদ 'ই-ঈ' বা 'ণ-ন'-র দ্বিধায় ছিলেন, কালীপ্রসন্ন 'ঈ' আর 'ণ'-কেই বরণ করে নিলেন। 'চড়্‌কী-জরী-টুপী-শাড়ী-বাড়ী-ঘড়ী'-পিসী আর 'সোণা-বেণে-লোণা' বানানে দেখছি তাঁর উৎসমুখীনতা। তবে, প্যারীচাঁদের তুলনায় কালীপ্রসন্ন এগিয়ে গেলেন অন্ততপক্ষে দুটি ক্ষেত্রে—এক, হস্‌চিহ্ন-প্রয়োগে (চড়্‌কী-সড়্‌সড়্‌-গর্‌রা-ফর্‌রা-ঝম্‌ঝম্‌-বাজ্‌তে-লাগ্‌লো), দুই ক্রিয়াপদের ও-কার প্রয়োগে (লাগ্‌লো-জুড়্‌লো-হলো-আস্‌বো-এলো)।

বঙ্কিমচন্দ্রের বানান-নীতি অনেকটা এইরকম—তৎসম-বানানে উৎস-বানানের ঐতিহ্যকেই মানা হচ্ছে (সঙ্গত বিশেষতঃ পৃথক্ আর্য্য), অ-তৎসম বানানে ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চারণ-মুখী বানান-লেখার ঝোঁক (হলো খ্রীষ্টিয়ান ল্যাজ) থাকলেও হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত (ফারসী-ফরাশি জমীদারী-বাহাদুরি উকীল-মুহুরি লীগ-সেক্রেটারি)। এরই পাশে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব আর 'ণ'-র প্রতি ঝোঁক—ঐতিহ্য-অনুসারী এই দুটি সূত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম-বানানের সীমানা ছাড়িয়ে অ-তৎসম বানানেও অতি সহজে প্রয়োগ করেছেন (আর্ম্মি-কার্ব্বন, গবর্ণর-কর্ণেল-সোণা-কেরাণী-কাণ)।

কেরি-রামরাম বসু থেকে বিদ্যাসাগর-প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্ন-বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বানান-প্রয়োগে মুখ্যত ঐতিহ্যকে মেনে চলার ঝোঁক দেখা গেলেও পাশাপাশি ঐতিহ্য-বিরোধী একটা ছকও ক্রমশ তৈরি হয়ে উঠছে বিশেষ করে প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নের চলিত রীতির বানানে। 'ঐতিহ্য' বলতে বুঝব উচ্চারণের কথা না ভেবে পুরোনো প্রথায় ঈ-ঊ-এ-ঙ্গ-ণ বা রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব বা তস্‌-শস্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দে বিসর্গ

দেওয়া—মূলত সংস্কৃত বানানের দিকে ঝুঁকে থাকা। আর, 'ঐতিহ্য-বিরোধী' বলতে বুঝে নেব ই-উ-ন-এর প্রয়োগ, উচ্চারণ অনুসারে অ্যা-ঙ-এর প্রয়োগ, রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব বা শব্দশেষে বিসর্গ না দেওয়া—মূলত উচ্চারণমুখী বানান লেখা।

১১২.৪.২ অনুশীলনী—২

১. (ক) ঙ-ং বর্ণ-প্রয়োগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঝোঁক কোন্ বর্ণের দিকে, উদাহরণ দিয়ে লিখুন।

(খ) হস্‌চিহ্ন প্রয়োগে বিদ্যাসাগরের দ্বিধা রয়েছে, এমন ১টি উদাহরণ লিখুন।

(গ) প্যারীচাঁদ মিত্র বর্ণ-প্রয়োগের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিন।

(ঘ) হুতোমি গদ্যে অ-তৎসম বানানে হস্-প্রয়োগের ৫টি উদাহরণ লিখুন।

(ঙ) বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত বানানরীতি ভেঙেছেন, এরকম ৪টি ক্ষেত্র উল্লেখ করুন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ১টি করে উদাহরণ লিখুন।

২. বানান-প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন—উইলিয়ম কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়।

৩. ১৮১৮ থেকে ১৮৪০—এই সময়ের সাময়িকপত্রে বাংলা বানান-প্রয়োগের যেসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, প্রাসঙ্গিক উদাহরণসহ তা উল্লেখ করুন।

৪. ঐতিহ্যকে মেনে চলা, ঐতিহ্যকে অমান্য করা, আর এ-দুয়ের মধ্যে দ্বিধা—আলালি আর হুতোমি বানানের এই তিনরকম পরিচয় উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৫. বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনায় যে বানাননীতির প্রতিফলন ঘটেছে, যথাযোগ্য উদাহরণ-সহযোগে তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. বানান-প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র কতটা ঐতিহ্য-অনুসারী, কতটা ঐতিহ্য-বিরোধী আর কতটা দ্বিধাগ্রস্ত, উদাহরণের সাহায্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭. উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত—বিশিষ্ট গদ্যলেখকদের গদ্যরচনায় বানান-বিবর্তন কীভাবে ঘটে চলেছে সংক্ষেপে তা বিবৃত করুন।

১১২.৫ মূলপাঠ-৩ ঃ রবীন্দ্রনাথ-প্রমথচৌধুরী-অন্নদাশঙ্কর রায়

আগের মূলপাঠে উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র—এই কালপর্বের গদ্যবানানের গতিবিধি খানিকটা আন্দাজ করলেন। এবার দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাত ধরে বাংলা বানান কোন্ পরিণামে উত্তীর্ণ হল, পৌঁছে গেল একুশ শতকের দোরগোড়ায়।

উনিশ-বিশ শতকের বাংলা ভাষাচর্চা আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন, বাংলা বানানের বিবর্তন-প্রক্রিয়াতেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ একটা বড়ো জায়গা দখল করে রেখেছেন। প্রাথমিক ঐতিহ্য-আনুগত্যের শক্ত বাঁধন খুলতে খুলতে ক্রমশ একটি স্থির নীতির মুক্ত অঙ্গনে এসে তিনি কীভাবে স্থির হলেন, এটা বিস্ময়ের। দেখা যাবে, বানান-প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ সময়ের অগ্রবর্তী।

এবারে আসুন, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্য বনফুল-কবিকাহিনী-সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীত আর শেষজীবনের কাব্য জন্মদিনে-শেষলেখা খুলে দেখি, বানান-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক কোন্‌দিকে বাঁক নিচ্ছে তা আন্দাজ করতে চেষ্টা করি।

প্রথমে দেখা যাক তৎসম বানান—

১. ই-ঈ ঃ 'বনফুল' কাব্যের পাতায় পাতায় দেখবেন '**কুটীর**' এর দীর্ঘ ঈ-কার, 'বনফুলে'র দ্বিতীয় সর্গে দেখুন—'কে ওগো **কুটীর**বাসি! দ্বার খুলে দাও আসি!' অথচ, 'গীতমালিকা-২' এর অতি পরিচিত 'যেতে দাও গেল যারা' গানটিতে দেখুন—'**কুটিরে কুটিরে** বন্ধ দ্বার'। দুটি ক্ষেত্রেই কুটিরের দ্বারা বন্ধ, তবে দ্বিতীয় 'কুটির' দীর্ঘ ঈ-কারের দ্বার খুলে মুক্তি পেয়েছে হ্রস্বই-কারে। অবশ্য, কুটির-কুটীর বানানে ই-ঈর দ্বিধা রবীন্দ্রনাথ কাটিয়ে ওঠেন নি ১৯৪১-এর 'সভ্যতার সংকটে'-ও, ফিরে এসেছেন পুরোনো 'কুটীরে'-ই—'আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত '**কুটীরের** মধ্যে,' 'ভঙ্গী' তার ঈ-কার বহাল রেখেছে 'জন্মদিনে' কাব্য পর্যন্ত—'শুধু **ভঙ্গী** দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ' (১০নং কবিতা) অথবা 'বিচিত্র তাদের ভঙ্গী' (২০নং কবিতা)। অবশেষে 'ভঙ্গী' ঈ-কারের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এল 'শেষ লেখা' কাব্যের ১৪নং কবিতায়—'কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট **ভঙ্গি** যত'।

তৎসম বানানে ঈ-র প্রতি পক্ষপাত রবীন্দ্রনাথ এড়াতে পারেননি কোনওকালেই। কাকলী-লহরী-বন্দী-নাড়ী-শ্রেণী-অন্তরীক্ষ বানানে বিকল্প ই-র প্রয়োগ প্রায় নেই-ই। তবে পদ্যে ই-ঈর দ্বিধা বা ঈ-কারের দিকে ঝোঁক যতটা ছিল, গদ্যে ততটা নয়। এমনকী, গদ্যে ঝোঁকটা যে ই-কারের দিকেই, এটা বোঝাতে গিয়ে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা বানান' বই-এর ৪১-পৃষ্ঠায় জানাচ্ছেন—'রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক হ্রস্ব ই-কারের দিকে, ...'**ঘটী**' শব্দ সংস্কৃত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লেখেন '**ঘটি**'। .....একখান চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ '**দায়ী**' শব্দের বানান লিখেছিলেন '**দায়ি**'।

২. উ-ঊ ঃ 'বনফুল'-এর 'ওই রে কুমারী **ঊষা** বিলোল চরণে' অথবা 'শুকতারা প্রকাশিবে **ঊষার** কপোলে' থেকে বেরিয়ে-আসা 'ঊষা' উ ছেড়ে '**ঊষায়** পরিণত হল রবীন্দ্র-প্রতিভার উষালগ্নেই—'কবিকাহিনী'র শুরুতেই—'**প্রফুল্ল ঊষার** ভূষা অরুণকিরণে'। এই উ-কারযুক্ত 'উষা'-ই টিকে রইল 'তুমি উষার সোনার বিন্দু' (গীতবিতান) অথবা 'উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি' (লেখন)-তে।

৩. ঙ-ং ঃ ১৮৭৬-এ লেখা সমালোচনামূলক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ '**আর্যসঙ্গীত**' কথাটি প্রয়োগ-করলেন ('ভুবনমোহিনী, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী')। ১৮৭৮-এর 'কবিকাহিনী'-তেও শুনতে পেলাম 'আরণ্য বিহঙ্গের স্বাধীন **সঙ্গীত**'। তবে, এর পাঁচ বছরের মধ্যেই তাঁর '**সন্ধ্যাসংগীত**' আর '**প্রভাতসংগীত**' কাব্য লেখা হল—'সঙ্গীত' উত্তীর্ণ হল 'সংগীতে' এবং সেই থেকে শুরু করে 'নিখিলের **সংগীতের স্বাদ**' কবি গ্রহণ করলেন ১৯৪১-এর 'জন্মদিনে' কাব্য পর্যন্ত। এমনি করে প্রথম জীবনের 'সঙ্গীত' 'সঙ্কুচিত' ক্রমশ 'সংগীত' 'সংকুচিত' হয়ে তা প্রসারিত হয়েছে সংকীর্ণ-সংকট-অলংকরণ-সংকেত-ঝংকারে।

৪. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ সচেতন রবীন্দ্র-স্বভাব চিরকাল রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-প্রয়োগের বিরোধী। আর্য-ঊর্ধ্ব-মুহূর্ত-পর্বত-সৌন্দর্য-সূর্য-মর্ত্য তাঁর লেখায় বারবার একক ব্যঞ্জন নিয়েই হাজির থেকেছে। পাণ্ডুলিপিতে দ্বিত্ব প্রয়োগ করেও প্রুফে নিজে তা সংশোধন করে দিয়েছেন, এমন উদাহরণও প্রচুর।

৫. বিসর্গ-প্রয়োগ ঃ বিসর্গ-প্রয়োগকে রবীন্দ্রনাথ যে বাহুল্য গণ্য করেছিলেন বনফুল-কবিকাহিনী-সন্ধ্যাসংগীত থেকেই, 'নিশ্বাস'-এর বারবার প্রয়োগ থেকেই তা বোঝা যায়। 'বনফুলে'র 'ক্রমশঃ' কিছুকাল বিসর্গান্ত থেকে অবশেষে 'ক্রমশ' হয়ে পৌঁছে গেছে 'সভ্যতার সংকট'-এ।

প্রথমজীবনে 'প্রথমতঃ-দ্বিতীয়তঃ-স্বভাবতঃ' বানান অন্ত্য বিসর্গ দিয়ে শুরু করলেও তা বেশিদিন টেকে নি। ১৮৭৭-এর মেঘনাদবধকাব্য-সমালোচনা প্রবন্ধে 'কার্যত' বানানটি প্রয়োগ করলেন অন্ত্য বিসর্গকে উচ্ছেদ করেই। অন্ত্য বিসর্গ এড়িয়ে যাবার এই স্বাভাবিক ঝোঁকটাই তাঁর লেখায় শেষ পর্যন্ত বহাল থেকেছে।

৬. হস্‌চিহ্ন ঃ শব্দে হস্‌চিহ্ন দেবার ঝোঁকটাই কবির প্রথম জীবনের, এবং খানিকটা দ্বিধা নিয়েই। দ্বিধা ছিল মহান-মহান্ বানানে। 'বিপদ' আর 'সম্পদ' স্বতন্ত্র বানানে হস্‌চিহ্নহীন, সমাসবদ্ধ হলেই হস্‌চিহ্ন নিয়ে হয়ে উঠত 'বিপদ্‌গ্রস্ত' 'সম্পদ্‌বান' (সভ্যতার সংকট)। 'দিক্' বানানটিও গোড়ার দিকের হস্-ঝোঁক কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত হস্‌মুক্ত 'দিক' হয়ে উঠেছে শেষজীবনের 'মহাজাতিসদন' 'আরোগ্য' জাতীয় প্রবন্ধে। তবে, 'অবাক্-নির্বাক' বানানকে হস্ থেকে রেহাই দেওয়া কবির পক্ষে অসাধ্যই থেকে গেল। তাঁর 'জন্মদিনে' (১৯৪১) কাব্যেও দেখি—'এসো কবি অখ্যাত জনের/নির্বাক্ মনের....

এবারে চলুন, অ-তৎসম শব্দে রবীন্দ্রনাথের বানান-প্রয়োগ কোন্ নীতিতে চলছে, দেখা যাক।

১. ই-ঈ ঃ অব্যয় হোক বা সর্বনাম-বিশেষণ হোক, 'কি'-শব্দের এই দু-রকম প্রয়োগেই ই-কার যুক্ত হবার প্রথা দীর্ঘকালের। কোনও কোনও প্রাচীন রচনায়, এমনকী 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সর্বনাম-বিশেষণ অর্থে 'কী'-র প্রয়োগ থাকলেও আধুনিক যুগের লেখায় কেবলমাত্র 'কি' চলছিল। রবীন্দ্রনাথ নতুন করে পৃথক করলেন কি-কী শব্দদুটি। 'বনফুল'-এর **কি** বলিব বোন' অথবা 'কবিকাহিনী'র 'কি কবিতা লিখেছ যে জ্বলন্ত অক্ষরে'—কিশোর কবির এই সর্বনাম-বিশেষণ 'কি' কিশোর বয়সের 'সন্ধ্যাসংগীতে'-ই 'কী' হয়ে এল বারবার—

'মনে পড়ে—**কী** ছিল, **কী** নাই।'
'মৃদু মৃদু ও **কী** কথা কহিস আপন মনে'
'কেন গো, **কী** হয়েছিল তার।'
'ও **কী** সুরে গান গাস, হৃদয় আমার?'
'**কী** ভাব তোমার মনে জাগে—'

এরপর থেকে সর্বনাম বা বিশেষণ 'কী'-ই রইল চূড়ান্ত হয়ে।

তৎসম বানানে, বিশেষ করে পদ্যলেখার বানানে ঈ-কারের প্রতি কবির পক্ষপাত একটু আগেই দেখলেন। কিন্তু, অ-তৎসম বানানে 'ঈ' থেকে ই-কারের দিকে কবি ঝুঁকে পড়লেন নির্দ্বিধায়।

'কোথায় গাইছে **পাখী**'—বনফুল-কবিকাহিনীর এই 'পাখী' 'সন্ধ্যাসংগীতে' এসে অবলীলায় 'পাখি' হয়ে উঠল, ডানা থেকে ঝেড়ে ফেলল ঈ-কার, ই-কারের ডানা মেলে উড়ে চলল 'শেষলেখা' পর্যন্ত—

'ওরে **পাখি**,
থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর,
যাস নে কেন **ডাকি**—'

'বিদেশী' 'তীর' ('বাণ'-অর্থে)-এ ঈ-কার অব্যাহত, আদরিনী-ভিখারিনী-কাঙালিনী-পূজারিনীর ঈ-কার কখনও কখনও দ্বিধাগ্রস্ত, তবে আশি-তাঁতি-শরিক-বাঁশি-বাড়ি-তৈরির মতো অজস্র বানানে ই-কারেরই আধিপত্য। গোড়ার দিকের লেখায় 'নীচে' বানানের ঝোঁক কাটিয়ে অবশেষে 'নিচে'-তেই কবি স্থির থাকলেন জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত। 'ফরাসী' শব্দে দ্বিধা থাকলেও নির্দ্বিধায় লিখলেন বাঙালি-ইংরাজি-ইংরেজি।

২. অ-ও ঃ অ-ও প্রয়োগে কিছু কিছু বানানের ক্ষেত্রে কিশোর রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্ত, ঝোঁকটা যদিও ও-কারের দিকেই। দ্বিধা ছিল মুখ্যত ভাল-ভালো ভালবাসা-ভালোবাসা মত-মতো কোন-কোনো বানানে।

ও-কারের ঝোঁকটাই যে কবির স্বভাবগত, তার প্রমাণ তো-হয়তো-কারো-বারো-আরো-ছোটো-বড়োর মতো শব্দ-বানানে, বিশেষ করে বনফুল-কবিকাহিনী কাব্যে ক্রিয়াপদের বানানে—হোতে-হোলে-হোলো-হোয়ে-হোয়েছে-রোয়েছে-কোরে-কোরেছে শব্দে। 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে অবশ্য এ ঝোঁক একটি মাত্রাসীমার মধ্যে এসে স্থির হয়েছে। তবে, অতিরিক্ত বোঝাতে ও-বর্ণের বদলে ও-কার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—তোমারো-আমারো-তারো-এখনো-তখনো। এর আগে রামমোহন রায়ের রচনায় কিঞ্চিতো (কিঞ্চিৎ + ও) প্রত্যয়ো-লোকো প্রয়োগের উল্লেখ করেছিলেন মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যেও দেখা গেছে 'আজো-আরো' বানানের প্রয়োগ। তবে, রবীন্দ্ররচনায় এই ঝোঁকটা প্রবল হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়।

৩. ঙ্গ-ঙ-ং ঃ ঐতিহ্য মেনে এই তিনটি বিকল্প থেকে 'ঙ্গ'-বর্ণটি বাছাই করেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হল গদ্য-পদ্য লেখায়। তবে, বনফুল-কবিকাহিনীর **ভাঙ্গিল-ভাঙ্গিব-ভেঙ্গে-ভাঙ্গে** 'সন্ধ্যাসংগীতে'র '**ভাঙে** তো **ভাঙিবে** বাদ্য' আর 'প্রভাতসংগীতে'র '**ভাঙ্‌রে** হৃদয় **ভাঙ্‌রে** বাঁধন' বা 'আমি **ভাঙিব** পাষাণকারা'-য় এসে ভেঙে গেছে ঙ-গ এর দুটি টুকরোয়, নিশ্চিহ্ন হয়েছে 'গ'। এই 'ঙ'-কেই কবি টেনে নিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। এমনকী, প্রথম গদ্যের বাঙ্গালি-বাঙ্গালাও 'ছিন্নপত্র' থেকেই পরিণত হয়েছে বাঙালি-বাঙলায় এবং অবশেষে 'বাঙলা' হয়েছে 'বাংলা'।

৪. ণ-ন ঃ ণ-প্রয়োগের সংস্কার থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই মুক্ত। তাঁর বানানে বারবার এসেছে কান-সোনা-পরান-বরনের 'ন'। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বই-তে পুজারিণী-পূজারিনী-পূজারিনি বা 'রাজা ও রাণী'-'রাজা ও রানী'-র দ্বিধা থাকলেও কবি নিজে সে দ্বিধাকে অতিক্রম করে 'ন'-র দিকেই ঝুঁকেছিলেন।

এতক্ষণ যেটুকু তথ্য রবীন্দ্রনাথের লেখায় বানান-প্রয়োগ বিষয়ে দেওয়া গেল, তা থেকে রবীন্দ্রনাথের বানান-প্রবণতার এই কটি দিক ধরা পড়ে—

১. তৎসম গদ্য বানানে কবির ঝোঁক খানিকটা ই-কারের দিকে থাকলেও পদ্য বানানে ঝোঁকটা ঈ-কারের দিকেই। অ-তৎসম বানানে অবশ্য ই-কারটাই কবির পছন্দ। উ-ঊর বিকল্পে উ-কেই কবি বেছে নেন।

২. তৎসম বানানে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব কবি চিরকাল এড়িয়ে চলেন।

৩. তৎসম শব্দে বিসর্গ-প্রয়োগ কবি পছন্দ করেন না।

৪. তৎসম বানানে হস্‌-প্রয়োগে কবি দ্বিধাগ্রস্ত, শেষ দিকে অবশ্য হস্‌-বর্জনের ঝোঁকটাই দেখা গেছে।

৫. 'ঙ্গ'-র বদলে 'ঙ'-র বদলে 'ং' প্রয়োগের দিকেই কবির ঝোঁক।

৬. অ-তৎসম শব্দের ও-উচ্চারণে অ-কারের বদলে ও-কারের প্রতি কবির পক্ষপাত।

চলে আসি **প্রমথ চৌধুরীর** বানান-রাজ্যে।

১৯৩৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতি গড়ে ওঠার আগেকার পর্বে বাংলা বানানকে নতুন কালের রুচি অনুসারে নতুন চেহারা দেবার দায়িত্ব যাঁরা কাঁধে তুলে নিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীকে একজন অগ্রবর্তী গদ্যলেখক হিসেবে গণ্য করা চলে। ১৯৮০ থেকে ১৯৩১—এই কালপর্বে লেখা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু শব্দ-বানান চয়ন করে বানান-প্রয়োগে প্রমথ চৌধুরীর প্রবণতা কোন্‌দিকে তা ধরার চেষ্টা করা যাক।

১. **জয়দেব (১৮৯০) ঃ** ভালো-কোনো, সংগীত, কান, কার্য-সৌন্দর্য, প্রথমতঃ-বশতঃ-অন্ততঃ।

২. **বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা (১৯১৩) ঃ** স্বদেশি-ভঙ্গি কোনো বাংলা।

৩. **বর্তমান বঙ্গসাহিত্য (১৯১৫) ঃ** বেশি-তৈরি, ঊনবিংশ, সংকট-সংকুচিত-সংকীর্ণ-ভয়ংকর, মূলতঃ, পৃথক্-সম্যক্।

৪. **আমাদের ভাষা-সংকট (১৯২২) ঃ** বাঙালি-ফরাসি-ইংরেজি-আরবি-ফারসি-জমিদারি-নবাবি-ভালোবাসা-ভালো-কোনো-কখনো বাংলা-সংকর কান-জার্মান কথাবার্তা-কার্য-আর্য-আশ্চর্য-ধর্ম-পূর্ব।

৫. **হর্ষচরিত (১৯৩০) ঃ** ইংরেজি, নামাবলী, সংগত, সোনা, মর্ম-কদর্য, সম্ভবতঃ-ইতস্ততঃ।

৬. **পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ (১৯৩১) ঃ** বাঙালি-নবাবি, পীর-সুফী, কোনো, সংগত, কোরান, ধর্ম, বশতঃ-অন্ততঃ-সম্ভবতঃ।

একালের বানান-বিতর্কের জায়গাগুলি ধরে ধরে প্রমথ চৌধুরীর প্রয়োগ থেকে তালিকাবদ্ধ ঐ শব্দগুলি নতুন করে সাজিয়ে নিই—

১. ই-ঈ ঃ স্বদেশি ভঙ্গি বেশি তৈরি বাঙালি ফরাসি ইংরেজি ফারসি জমিদারি নবাবি। নামাবলী পীর সুফী।

২. উ-ঊ ঃ ঊনবিংশ।

৩. অ-ও ঃ ভালো কোনো ভালোবাসা কখনো।

৪. ঙ-ং ঃ সংগীত সংকট সংকুচিত সংকীর্ণ ভয়ংকর সংকর সংগত বাংলা।

৫. ণ-ন ঃ কান জার্মান সোনা কোরান।

৬. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ কার্য সৌন্দর্য কথাবার্তা আর্য আশ্চর্য ধর্ম পূর্ব।

৭. বিসর্গ-প্রয়োগ ঃ প্রথমতঃ বশতঃ অন্ততঃ মূলতঃ সম্ভবতঃ ইতস্ততঃ।

৮. হস্-প্রয়োগ ঃ পৃথক্ সম্যক্।

উপরের বানান-বিন্যাস থেকে এই তথ্যই বেরিয়ে এল যে, প্রমথ চৌধুরী গদ্য-বানানে ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসার নজির রাখলেন প্রায় পুরোপুরি। হ্রস্ব-দীর্ঘ বানানের জটিলতা এড়িয়ে কেবল হ্রস্বস্বরচিহ্ন প্রয়োগ, শব্দশেষের ও-উচ্চারণে ও-কার দেওয়া, ঙ-ংর বিকল্প থেকে 'ং' (অনুস্বার) বেছে নেওয়া, অ-তৎসম বানানে ণত্ববিধির সংস্কার কাটিয়ে (জার্মান-কোরান) বা উৎস-বানানের আকর্ষণ এড়িয়ে (কান-সোনা) 'ন'-র প্রয়োগ, রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-বর্জন—এর প্রতিটি ঝোঁকই ঐতিহ্য-বিরোধী ঝোঁক। ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থাকার প্রবণতা দেখা গেল কেবল তৎসম শব্দশেষে তস্-প্রত্যয় থেকে পাওয়া বিসর্গের সংযোগে আর 'পৃথক্-সম্যক্' শব্দের শেষে হস্‌চিহ্ন প্রয়োগে। এ ছাড়া, প্রথা মেনে চলার আর একটিমাত্র ব্যতিক্রমী উদাহরণ 'নামাবলী-পীর-সূফী' বানানে ই-কারের বদলে ঈ-কারের দিকে হাত বাড়ানো।

১৯২৭ থেকে ২০০১—এই সময়ের মধ্যে বানান-লেখার ক্ষেত্রে **অন্নদাশঙ্কর রায়ের** অবস্থানটা কী, তা নির্ণয় করতে তাঁর প্রয়োগ থেকে কিছু কিছু শব্দ-বানানের নমুনা সংগ্রহ করা যাক।

ও-উচ্চারণে শব্দশেষে ও-কার লেখার ঝোঁক অন্নদাশঙ্করের লেখায় গত সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছে। ১৯২৭-২৯-এ লেখা 'পথে-প্রবাসে'-তে পাওয়া যাচ্ছে ভালো-কোনো-এমনো-এখনো-কারো-মতো-আজো, এমনকী হতো-হলো-জানালো-র মতো ও-কারান্ত ক্রিয়াপদ। ঐ বইটিরই শোভন সংস্করণের ভূমিকায় ১৯৯৭ সালেও দেখছি 'হতো'-র পাশে 'উঠতো'। ১৯৮৮ থেকে ২০০১-এর আকাদেমি পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলিতে ছড়ানো রয়েছে-নয়তো-হয়তো পনেরো-ভালো-এলো। গোড়ার দিকের 'এখনো-কারো' অবশ্য শেষের দিকে 'এখনও-কারও' চেহারা নিয়েছে, পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি 'আরও-তারও-আমারও'। 'আরো' ক্রমশ 'আরও'-র দিকে ঝুঁকছে। এর বিপরীত দিকেও ঝুঁকতে দেখছি আগেকার 'বড়'-কে, 'বড়'-ঝুঁকছে ও-কারান্ত 'বড়ো'-র দিকে।

অ-তৎসম শব্দে ঈ-কার প্রয়োগের ঝোঁক থেকে অন্নদাশঙ্কর ক্রমশ ই-কারে সরে এসেছিলেন অনেকখানি। একসময়কার ফরাসী-জার্মানী-সরকারী-চাকরী অথবা বাকী-বাঙালী-বন্দী-হাতীর ঈ-কার ছেড়ে শতকের শেষদিকে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন ফরাসি-জরুরি-সরকারি-কোম্পানির ই-কারে। এমনকী, তৎসম বানানেও আগেকার 'বিদেশী' শেষের দিকে 'বিদেশি', পাশাপাশি চলছে পদবি-শ্রেণি-কবিতাবলি-পূর্বসূরির মতো ই-কারান্ত বিকল্প।

ঙ-ং প্রয়োগে অন্নদাশঙ্কর মুখ্যত অনুস্বার-পন্থী হলেও কখনও-সখনও কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত। তিরিশের দশকে যেমন দেখি 'সংগীত'-এর পাশে 'সঙ্কট', নব্বই-এর দশকে তেমনি উল্টো করে দেখি 'সঙ্গীত'-এর পাশে 'সংকট'। বিসর্গ-প্রয়োগেও এরকম দ্বিধা লক্ষ করা যাবে 'ক্রমশ'-র পাশে 'অন্ততঃ' বানানে। অবশ্য, 'অ-তৎসম 'তফাৎ' শতকের শেষে 'ৎ'-কে উচ্ছেদ করে 'তফাত' হয়ে গেছে তাঁর লেখায়।

এরকম দুটি-একটি দ্বিধার এলাকা ছেড়ে দিলে বাকি সবক্ষেত্রেই মুখ্যত হ্রস্বস্বর-প্রবণ উচ্চারণ-মুখী সরলীকৃত বানানের পক্ষপাতী থেকেই অন্নদাশঙ্কর পূর্ণ করে গেলেন তাঁর দীর্ঘ লেখক-জীবন।

১১২.৫.১ সারাংশ—৩

বাংলা বানানের তৃতীয় দফায় আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্নদাশঙ্কর পর্যন্ত বানান-চর্চার ধারাটি।

রবীন্দ্রনাথ বানান-লেখার পাশাপাশি বানান নিয়ে ভাবছেন—অভ্যাসের টানে যে-বানান লিখছেন, সংস্কারের টানে তা সংশোধন করছেন। পাণ্ডুলিপির বানান আর মুদ্রিত বানানে তাই কিছু কিছু ফারাক থাকছেই। মুদ্রিত বানানের উপর নির্ভর করে বলা যায়—অ-তৎসম বানানের এলাকা তো বটেই, এমনকী তৎসম বানানেও তিনি প্রথাগত বানানের দেয়ালটা মাঝে মাঝে টপকে এসেছেন। তৎসম বানানে উ-ঊর বিকল্পে উ-কে (উষা) অথবা রেফের নীচে একক ব্যঞ্জনকেই তিনি বেছে নেন (আর্য-পর্বত-মর্ত্য), শব্দশেষে বিসর্গ প্রয়োগ তিনি এড়িয়ে চলেন (কার্যত ক্রমশ), 'ঙ-ং' থেকে বিকল্প 'ং'-কেই বহাল রাখেন (সংগীত-সংকীর্ণ-সংকুচিত)। তবু দ্বিধা ছিল তাঁর তৎসম-বানানে হস্‌চিহ্ন-প্রয়োগে (মহান-মহান্), খানিকটা দ্বিধা দেখালেন ই-ঈ প্রয়োগেও (কুটির-কুটীর)। কিন্তু অ-তৎসম বানানে নির্দ্বিধায় তিনি ঝুঁকেছেন হ্রস্বস্বরের দিকে ('পাখী থেকে 'পাখি', আশি-তাঁতি-শরিক-বাড়ি), শব্দশেষে ও-উচ্চারণে ও-কার লেখার দিকে (তো-হয়তো-তখনো-কারো-আরো-বারো)। সব মিলিয়ে উৎস বানানের প্রতি ঝুঁকে থাকার প্রথাগত প্রবণতা কাটিয়ে উচ্চারণ-অনুসারী বানানের দিকে এগিয়ে আসার আধুনিক প্রবণতাকেই রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানালেন, খানিকটা উস্‌কেও দিলেন।

বাংলা শব্দ-বানানে আধুনিকতার দিশারি রবীন্দ্রনাথ। আর, প্রমথ চৌধুরী তাঁর যোগ্য সহযোগী। তৎসম বানানে শব্দশেষে বিসর্গ (প্রথমতঃ বশতঃ অন্ততঃ সম্ভবতঃ) আর হস্‌চিহ্ন প্রয়োগের (পৃথক্ সম্যক্) প্রথাগত অভ্যাসটুকু ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই প্রমথ চৌধুরী দ্বিধামুক্ত প্রথামুক্ত আধুনিক। তৎসম বানানে 'ঙ'-র বদলে 'ং' (সংকর সংকট সংকীর্ণ) রেফের নীচে একক ব্যঞ্জন (বার্তা কার্য ধর্ম), 'ই-ঈ'র বিকল্পে ই-কারের

প্রয়োগে (ভঙ্গি স্বদেশি) দেখা যায় প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। একইভাবে অ-তৎসম বানানে নির্দ্বিধায় ই-কারের প্রয়োগ (বাঙালি ফরাসি ফারসি আরবি), শব্দশেষে ও-উচ্চারণ বোঝাতে ও-কার (কোনো ভালো), 'ণ'-কে পুরোপুরি বর্জন করে 'ন'-এর প্রয়োগ (কোরান সোনা কান জার্মান)—এসবই বাংলা বানানকে আধুনিক করে তোলার সাহসিক প্রয়াস। ব্যতিক্রমী প্রয়োগ দুটো-একটা চোখে পড়লেও ('পীর-সুফী'-তে ঈ-কার) প্রমথ চৌধুরী ঐতিহ্যের প্রাচীর পেরিয়ে আধুনিকতাকেই আবাহন করলেন তাঁর বানান-চর্চায়।

প্রায় পঁচাত্তর বছরের গদ্যচর্চায় অন্নদাশঙ্কর অ-তৎসম বানান নিয়ে কখনও এগিয়েছেন, কখনও খানিকটা পিছিয়েছেন, কখনও স্থির থেকেছেন একই বানানে। গোড়ার দিকের ঈ-কার (ফরাসী-জার্মানী-চাকরী-সরকারী বাঙালী-বন্দী-বাকী-হাতী) ক্রমশ শেষদিকে উত্তীর্ণ হয়েছে ই-কারে (ফরাসি-জরুরি-সরকারি-পদবি-কোম্পানি), তাঁর অনুস্বার-পন্থী কলমেও তিরিশের দশকের 'সংগীত' নব্বই-এর দশকে হয়ে পড়ল 'সঙ্গীত'। কিন্তু শব্দশেষের ও-কার থেকে তাঁকে কখনও অ-কারে সরে আসতে দেখা যায় নি (ভালো কোনো মতো), বরং শব্দশেষে ও-কারের ঝোঁক তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার প্রয়োগের বিতর্কিত এলাকায় (হতো উঠতো এলো)। অবশ্য, অতিরিক্ত বোঝাতে-আজো-এখনো-কারো বানানের ও-কার ক্রমশ বদলে গেছে ও-বর্ণে (আজও-এমনও-কারও)। তৎসম বানানেও ই-কারান্ত বিকল্প প্রয়োগকেই তিনি পছন্দ করলেন (শ্রেণি-কবিতাবলি-পূর্বসূরি), আগেকার অ-তৎসম 'বিদেশী'-ও হয়ে উঠল 'বিদেশি'।

১১২.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. তৎসম এবং অ-তৎসম শব্দে রবীন্দ্রনাথের বানাননীতি কী রকম ছিল, উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

২. বানান প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল, আবার বিশেষ একটি বর্ণের দিকে তাঁর ঝোঁকও ছিল—এরকম তিনটি ক্ষেত্র থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে ক্ষেত্র-তিনটি ব্যাখ্যা করুন।

৩. শব্দ-বানানে ই-ঈ প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক কোন্‌দিকে, এ বিষয়ে উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. প্রমথ চৌধুরীর বানাননীতি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৫. প্রমথ চৌধুরীর বানান-প্রয়োগ ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থাকার নজিরগুলি উল্লেখ করুন।

৬. শব্দশেষে ও-উচ্চারণে অ-কার আর ও-কারকে অন্নদাশঙ্কর রায় কোথায় কীভাবে প্রয়োগ করেছেন, দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখিয়ে দিন।

৭. অন্নদাশঙ্করের বানান-প্রয়োগের দ্বিধার এলাকাগুলি চিহ্নিত করুন।

৮. ই-ঈর প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-অন্নদাশঙ্করের প্রবণতার মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় গরমিল, দেখিয়ে দিন।

১১২.৬ সহায়ক পাঠ

একক-১ এর মূলপাঠে বানান-প্রয়োগের উদাহরণ দেখাতে গিয়ে যেসব গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা নীচে দেওয়া হল। গ্রন্থনামের সঙ্গে গ্রন্থের লেখক বা সম্পাদকের নাম, সেইসঙ্গে গ্রন্থের সংস্করণ, বা প্রকাশনারও উল্লেখ যথাসম্ভব করা হল।

১. চর্যাপদ ঃ সম্পাদক—মণীন্দ্রমোহন বসু, প্রকাশনা—কমলা বুক ডিপো।

২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ সম্পাদক—বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ, প্রকাশনা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৬১ সাল)।

৩. কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (কালকেতু-ফুল্লরা) ঃ কবি—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী,
সম্পাদক—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী,
প্রকাশনা— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।

৪. অন্নদামঙ্গল ঃ কবি—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, প্রকাশনা—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

৫. পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকল (প্রথমখণ্ড) ঃ সম্পাদক—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্করণ, (২০ জানুয়ারি, ১৯৭৮)।

৬. সাময়িকপত্রে সেকালের কথা ঃ সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রকাশনা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় সংস্করণ (মার্চ ১৩৫৬)।

৭. বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ ঃ প্রধান সম্পাদক— গোপাল হালদার,
প্রকাশনা— পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি,
তৃতীয় সংস্করণ (১৯৭৪)।

৮. সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) ঃ প্রকাশনা—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

আলালের ঘরের দুলাল (পৃ - ১৪৭ থেকে ২৬৫) ঃ ভূমিকা (বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান/লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

হুতোম প্যাঁচার নকশা (পৃ - ১১১ থেকে ১৪৬)

৯. বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ ঃ সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ (এপ্রিল ১৯৭৩)।

১০. রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ প্রকাশনা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (১৯৬১)।

১১. প্রবন্ধ-সংগ্রহ (১ খণ্ড) ঃ লেখক—প্রমথ চৌধুরী,
প্রকাশনা—বিশ্বভারতী, আগষ্ট ১৯৫২।

১২. পথে প্রবাসে ঃ লেখক—অন্নদাশঙ্কর রায়,
প্রকাশনা—বাণীশিল্প, শোভন সংস্করণ, (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮)

১৩. আকাদেমি পত্রিকা ঃ সম্পাদক—বিজিতকুমার দত্ত,
প্রকাশনা—পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১-১৩ সংখ্যা)।

মূলপাঠ-১ এর জন্য চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (কালকেতুর উপাখ্যান) আর অন্নদামঙ্গল কাব্যের বানান-প্রয়োগ লক্ষ করুন।

মূলপাঠ-২ এর জন্য দেখুন উইলিয়ম কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কিছু রচনা, চোখ বুলিয়ে নিন প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র উপর, সেইসঙ্গে উল্টোতে থাকুন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে সেকালের কথা'-র পৃষ্ঠাগুলি।

মূলপাঠ-৩ এর আলোচিত বানানের উদাহরণ সংগ্রহ করা হয়েছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের বনফুল-কবিকাহিনী-সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীত-মানসী-জন্মদিনে-শেষলেখা কাব্য থেকে, শব্দতত্ত্ব-বাংলাভাষার পরিচয়-সভ্যতার সংকট থেকে। সেইসঙ্গে পড়ে নিন প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-সংগ্রহ আর অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে'।

উৎসুক শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি সুভাষ ভট্টাচার্যের লেখা 'বাঙালির ভাষা' বইটি থেকে ২০৩-৩১ পৃষ্ঠার 'বাংলা বানান সমস্যার সেকাল ও একাল' অংশটিও পড়ে নিতে পারেন।